আসামের অশান্তি প্রসঙ্গে

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

সর্ব সেবা সংঘ প্রকাশন

আসাম পরিচিতি

আসাম প্রদেশের আয়তন 84,899 বর্গমাইল, তন্মধ্যে নর্থইষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী ও নাগাল্যাণ্ডসহ পার্বত্য অঞ্চল 32,289 বর্গমাইল

জনসংখ্যার চাপ গড়ে প্রতি বর্গমাইলে (1951) 106

জনসংখ্যা (1901) 38,14,000 ; (1911) 44,82,000 ; (1921) 53,16,000 ; (1931) 63,44,000 ; (1941) 75,93,000 ; (1951) 90,43,000 ; (1961 প্রাথমিক হিসাব) 1,21,48,000 ।

জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা (1951)
কাছাড়	2,688	11,15,865
দারাং	3,369	9,13,841
গারো হিল্‌স্	3,149	2,42,075
গোয়ালপাড়া	3,983	11,08,124
কামেং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন	5,469	9,721
কামরূপ	3,804	14,90,392
লখীমপুর	4,927	10,78,157
লোহিত ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন	9,059	27,119
মিজো	8,134	1,96,202
কোহিমা	2,374	2,05,950
মোকোকচুং	1,924	1,07,891
নওগাঁ	2,167	8,86,955
সিয়াং ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন	8,196	10,761
শিবসাগর	3,453	12,12,224
সুবনশ্রী ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন	5,984	—
তিরাপ ফ্রন্টিয়ার ডিভিশন	2,730	5,213
তুয়েন সাং	2,064	7,025
ইউনাইটেড খাসী জয়ন্তিয়া হিল্‌স্	5,541	3,63,599
ইউনাইটেড মিকির এণ্ড নর্থ কাছাড় হিল্‌স্	5,878	1,65,440

('ইণ্ডিয়া ইন 1961' ও সেন্সাস রিপোর্ট হইতে সংকলিত)

আসামের অশান্তি প্রসঙ্গে

Thoughts on Assam Disturbances

এর বঙ্গানুবাদ

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

অনুবাদ :
সুধীরচন্দ্র লাহা

সর্বোদয়

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি ৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

প্রকাশক :
সমরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর
সম্পাদক, সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি ৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৬১ : : ২২০০

মূল্য : পঞ্চাশ নয়া পয়সা

आसामेर अशान्ति प्रसंगे Thoughts on Assam Disturbances का बंगानुवाद चारुचन्द्र भंडारी अनुवादक : सुधीरचन्द्र लाहा मूल्य : पचास नये पैसे सर्वोदय प्रकाशन समिति सि ५२, कालेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता १२

মুদ্রক :
অজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩ বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

বর্ণানুক্রমিক সূচী

বর্ণানুক্রমিক সূচী

আসামে অশান্তি

জুলাই মাসের ভয়াবহ উপদ্রব

আসামে বিগত জুলাই (১৯৬০) মাসে দারুণ অশান্তির উদ্ভব হয়। এই উপদ্রবের গতি প্রকৃতি ও তীব্রতা এমনই এবং ইহা এত ব্যাপক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, কেবল সরকারী ভাষা-আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া ঐরূপ ভয়াবহ ঘটনাবলী ঘটিতে পারে, একথা ভাবিতে স্বভাবতই আশ্চর্য লাগে। উক্ত উপদ্রবের অব্যবহিত পরে, চার মাস কাল সময় আসামে অতিবাহিত করি। আসাম উপত্যকার সকল স্থানেই আমি তখন যাতায়াত করি এবং খোলা মনে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করি।

কারণ কি ?

ভাষা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা কি ছিল, আন্দোলনের তীব্রতায় ইন্ধন যোগাইয়া উহাকে এরূপ ব্যাপক ও মর্মান্তিক করিয়া তুলিবার পশ্চাতে অন্য কোন কারণ ছিল কি না এবং থাকিলে, সেই সব কারণগুলি কি হইতে পারে, তাহা অনুধাবন করিতে আমি যথাসাধ্য প্রয়াস করি।

পূর্বকথা

১৭৬৫ সালে বাংলাদেশ ব্রিটিশ শাসনের অধীন হয়। বাংলা দেশকেই ঘাটি করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসামে তাহাদের রাজ্য বিস্তার করে। ১৮২৬ হইতে ১৮৩২ এর মধ্যে আসামের বিভিন্ন অংশ তাহারা দখল করে এবং বঙ্গের একটি ডিভিশন রূপে একজন কমিশনার-এর অধীনে উহার শাসন-কার্যের সূচনা হয়। রাজকার্য চালাইবার জন্য ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে বাঙ্গালী আমলারাও সেই সময়ে আসামে আসেন।

ভাষা বিচারে ভুল

ভাষা সম্পর্কে সেই সময়ে একটি গুরুতর ভুল করা হয়। আসামী ভাষা বাংলা ভাষারই অন্যতম কথ্য শাখা, ভ্রান্তিক্রমে কর্তৃপক্ষ এই কথা মানিয়া লন। সেইজন্য আসামের রাজদপ্তরে আদালতে এবং স্কুলসমূহে তাঁহারা বাংলা ভাষা প্রবর্তন করেন। শিশুদেরও প্রাথমিক শিক্ষা বাংলা ভাষাতেই দেওয়া হইত।

অসমীয়া পৃথক ভাষা

কিন্তু আসলে অসমীয়া ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা, যদিও অসমীয়া ও বাংলা উভয় ভাষাই 'মাগধী' এই সাধারণ মূল ভাষা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

এইভাবে ভাষার ব্যাপারে অসমীয়াদের একটি বড় রকম ক্ষতি হয়।

মিশনরীদের চেষ্টা ও অসমীয়া ভাষার স্বীকৃতি

শিবসাগরে মার্কিন মিশনরীগণ অসমীয়াদের ভাষাগত এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এইভাবে উহা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা মিশনরীরা তাহা দেখাইয়া দেন। এই মিশনরীগণ এবং শ্রীআনন্দরাম ফুকন নামে জনৈক উচ্চপদস্থ অসমীয়া রাজকর্মচারী অসমীয়া ভাষাকে বাংলা হইতে পৃথক একটি স্বতন্ত্র ভাষা রূপে স্বীকৃতি দান এবং রাজকার্যে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে উহার যথাযোগ্য স্থান দিবার জন্য সরকারের নিকট আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দাবী যে যুক্তিযুক্ত সে কথা তাঁহারা অবশেষে সরকারকে বুঝাইতে সমর্থ হন। ফলে ১৮৭২ সালে আসামে স্কুল, অফিস ও আদালতসমূহে বাংলার পরিবর্তে অসমীয়া ভাষা প্রচলিত হয়।

পৃথক প্রদেশ গঠন

১৮৭৪ সালে বাংলা দেশ হইতে পৃথক করিয়া একজন চীফ্ কমিশনরের কর্তৃত্বাধীনে আসামকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে সংগঠিত করা হয়।

সেই সময় হইতেই কিন্তু শিক্ষিত অসমীয়াদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে বাঙ্গালীরা অসমীয়া ভাষার শত্রু এবং সেই কারণেই অসমীয়া ভাষা চল্লিশ বৎসরকাল চাপা পড়িয়া ছিল। ইহা হইতে পারে যে ব্রিটিশ রাজ বাঙ্গালী আমলাদের পরামর্শমত আসামে বাংলাভাষা প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত পরামর্শদান কালে অসমীয়া ভাষাকে চাপা দিবার কোন কুমৎলব বাঙ্গালী কর্মচারীদের ছিল কি না তাহা বিতর্কের বিষয়।

দুরভিসন্ধি আরোপ অনুচিত

আমার মনে হয় সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালী অফিসারদের প্রতি ঐরূপ দুরভিসন্ধি আরোপ করিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। ব্রিটিশের সঙ্গে আসিয়া তাঁহারা দেখিতে পান যে উভয় ভাষার লিপি প্রায় একরূপ এবং উভয় ভাষার মধ্যে মিল এত বেশী যে নবাগত কাহারও পক্ষে একটিকে অপরটির শাখা বলিয়া মনে করা অসাধারণ কিছু নয়। অবস্থা যদি বিপরীত হইত অর্থাৎ ব্রিটিশের বঙ্গবিজয় যদি আসাম জয়ের পর সংঘটিত হইত এবং যদি বৃটিশ কর্তাদের সঙ্গে অসমীয়া কর্মচারীরা বাংলায় আসিতেন, তবে মনে হয়, অজ্ঞাতসারে যে ভুল বাঙ্গালী আমলারা হয়তো করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই ভুলই করিতেন অর্থাৎ বাংলাদেশে অফিসে স্কুলে অসমীয়া ভাষা চালাইবার পরামর্শ ব্রিটিশ কর্তাদের দিতেন।

নিজ ভাষাতে মমতা জাগে নাই

এমন কথা কেন মনে করিতেছি তাহার অন্যান্য কারণও আছে। সেকালে বাংলা ভাষার এতটা বিকাশ হয় নাই। হয়ত বা তৎকালীন অসমীয়া ভাষার তুলনায় বাংলাভাষার বিকাশ কমই ছিল।

অতএব ভাষা লইয়া বিশেষ গর্বিত হইবার কোন কারণ তৎকালে বাঙ্গালীদের ছিল না। তাহা ছাড়া সেকালে বাঙ্গালীদের মধ্যে নিজ ভাষা বিষয়ে আত্মচেতনাও জাগে নাই। স্বদেশী ভাষা বিষয়ে সচেতনতা তখন

ভারতে কোথাও জাগে নাই। অধিকন্তু ইহাও বেশ জানা কথা যে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে বাঙ্গালীর মন মাতৃভাষার প্রতি বরং কতকটা বিরূপই ছিল। কাজেই অসমীয়া ভাষার প্রতি কোন দুরভিসন্ধিবশে সেকালে বাঙ্গালীরা কিছু করিবেন ইহা সম্ভবপর নহে।

সম্প্রীতির আবেদন

শিক্ষিত অসমীয়াদের এসব কথা হয়ত অজানা নাই। তথাপি মনে হয় যেন অসমীয়া ভাষার বিগত দুর্গতির কথা তাঁহারা তাঁহাদের মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই।

আসামের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির নামে আমি অসমীয়াভাষীদের প্রতি বিনম্র আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই সকল কথা গভীরভাবে তলাইয়া ভাবিয়া দেখুন এবং তাঁহাদের মনে, খুব সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন, যে কাল্পনিক ধারণা রহিয়া গিয়াছে, তাহা দূর করিয়া দিন।

'ড্রাগনের দাঁত'

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রতি যথাবিহিত সম্মানপূর্বক আমি বলিতে চাই যে, তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত 'ড্রাগনের দাঁত' নামক প্রবন্ধে, অসমীয়া ভাষার পৃথক লিপি আছে, একথা বলিয়া, এবং বাঙ্গালা লিপিকে অসমীয়া লিপি বলিয়া ভুল বুঝানো, বাঙ্গালী রাজপুরুষদের দুরভিসন্ধিপ্রসূত—এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া, তিনি আসামের জটিল অবস্থাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন।

অসমীয়া ভাষার পৃথক লিপি ছিল, একথা কি যথার্থ? ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভ্রমণকালে আমি কয়েকটি 'নামঘর' এবং 'সত্র' দর্শন করিতে যাই এবং তাঁহাদের প্রার্থনায় যোগ দিই।

'কীর্তন ঘোষ' পুঁথি

একটি নামঘরে একদিন একটি পুরাতন পুঁথি দেখিতে পাই। সাচি পত্রে

হস্তলিখিত ঐ পুঁথিটি সন্ত শঙ্করদেব লিখিত 'কীর্তন ঘোষ' পুস্তকের একটি অনুলিপি। ঐ পুঁথিটি বেশ পুরাতন, তবে উহা ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত প্রাচীনতর অপর একটি পুঁথির হুবহু অনুলিপি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অসমীয়া ভাষার মূল লিপি কিরূপ ছিল তাহা এই পুঁথির লিপি হইতে ধারণা করা যায়। পুঁথির লিপিতে দেখিলাম যে, **প, ধ, ব, এ, র,** ং, এবং **ক্ক**, এই কয়টি অক্ষর বাদে আর সকল অক্ষরই বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ, **প, ব,** এবং ং, এই অক্ষরগুলি দেবনাগরী লিপির অনুরূপ, **এ,** এবং **ক্ক**, ইহাদের রূপ ভিন্ন। পুঁথির সময় হইতে প্রথম অসমীয়া পুস্তক মুদ্রণের অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে ঐ অক্ষরগুলির কি কি আকার পরিবর্তন ঘটে তাহা আমার জানা নাই। ছাপার হরফে অক্ষরের রূপ বাঁধা পড়িয়া যাইবার পূর্বে কোন কোন বাংলা অক্ষরেরও আকার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিতে পারে। ছেলেবেলায় আমার পিতামহ '**র**' অক্ষরটিকে অসমীয়া 'ৰ'এর আকারে লিখিতেন এবং ঐ অক্ষরটিকে 'পেট কাটা ৰ' বলিতে শুনিয়াছি। অতএব অসমীয়া লিপি একবারে পৃথক লিপি ছিল একথা বলা চলে না।

অসমীয়া বাইবেল বাংলা হরফে

১৮১৭ সালে শ্রীরামপুরের মিশনরীরা অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত বাইবেল এর একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তখন আসাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। বইখানি স্পষ্টতই আসামদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য অসমীয়া পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। উদ্দিষ্ট পাঠকদের অপরিচিত কোন লিপিতে বাইবেল প্রকাশ করিবেন, সেই সব মিশনরী সাধুরা এমত নির্বোধ ছিলেন কি? শিবসাগরের মার্কিন মিশনরীগণ অসমীয়া ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহারাও একটি ভিন্ন লিপিতে, বিশেষতঃ অসমীয়া ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলা লিপিতে, ঐ পুস্তকগুলি প্রকাশ করিবেন, ইহা কি সম্ভবপর? যাহা হউক বাঙ্গালী রাজপুরুষরা যখন আসামে আসিলেন তখন

তাঁহারা বর্তমান অসমীয়া লিপিতে পূর্বেই মুদ্রিত অসমীয়া পুস্তকাবলী হাতে পাইলেন। মৌলিক অসমীয়া লিপি কিরূপ ছিল পূর্ব হইতেই তাঁহারা তাহা জানিতেন কি? পূর্বে অসমীয়া লিপি ভিন্ন ছিল এবং পরে উহার পরিবর্তে বাংলা লিপি চলে, একথা যথার্থ হইলেও, সংশ্লিষ্ট বাঙ্গালী রাজপুরুষেরা, অভিসন্ধিবশে অসমীয়া ভাষা ও লিপির বিরোধিতাকল্পে, বাংলা লিপি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এরূপ কষ্টকল্পনার পরিবর্তে, তাঁহারা বাংলা লিপিতে অসমীয়া পুস্তকের প্রচলন দেখিয়াই, ঐ পথে চালিত হইয়াছিলেন, ইহাই মনে করা সমীচীন নহে কি?

অসমীয়াকে কে তুচ্ছ করে

অসমীয়া ভাষাভাষীদের একাংশের মনে এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে বাঙ্গালীরা অসমীয়া ভাষাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা বাঙ্গালী মনীষীদের উক্তি ও রচনা দেখিলে, অসমীয়াভাষীদের এই ধারণা যে অমূলক, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। অসমীয়া যে একটি সুমহান ভাষা, তাহার প্রমাণস্বরূপ শিক্ষিত অসমীয়াভাষীরা প্রায়শই, এই বাঙ্গালী মনীষীদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একটি সভায় বলেন:

> "সেই সুদূর অতীত ষোড়শ শতাব্দীতে অসমীয়া গদ্য সাহিত্য এতদূর বিকাশ লাভ করিয়াছিল যে, ইংলণ্ডে হুকার এবং লাটিমার-এর রচনাবলী ছাড়া, জগতের আর কোন গদ্য সাহিত্য, ততটা বিকাশলাভ করিতে পারে নাই।"

স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যাধ মহাশয় ভট্টদেব কৃত ভগবৎগীতার অসমীয়া অনুবাদ 'কথাগীতা' সম্বন্ধে মন্তব্য করেন:

"যাঁহারা এরূপ গদ্যে গীতা লিখিতে পারেন তাঁহারা সামান্য নহেন।"

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা

পণ্ডিত হেমচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

"বাংলা ভাষায় কোন গদ্য পুস্তক রচিত হইবার শতবর্ষের অধিককাল পূর্বে রচিত ঐ পুস্তকের লেখক, যিনি ঐরূপ স্থললিত ভাষায় গদ্য রচনা করিতে পারিতেন, তাঁহার বিষয়ে আপনারা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করিতে পারেন।"

বিভিন্ন ভাষা বিকাশের বিজ্ঞান যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই জানেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান্ মহান ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিরূপ নিরপেক্ষ ও যুক্তিযুক্তভাবে অসমীয়া ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আসাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্য বিষয় রূপে বাংলা ভাষা শিক্ষণ ১৯২১ সালে প্রবর্তিত হয়। উহার মাত্র ৫ বৎসর পরেই ১৯২৬ সালে অসমীয়া সাহিত্যকেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ্য-বিষয়রূপে মর্যাদা দান করা হয়।

এত সত্ত্বেও কিন্তু বিরূপ ধারণা মনে একবার গাঁথিয়া গেলে সহজে যায় না।

গত কয়েক দশকে অসমীয়া সাহিত্য যে আরও বিকাশলাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসাম রাজ্য মধ্যেই অধিক বিকশিত সাহিত্য-সমৃদ্ধ সগোত্র অপর একটি ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অসমীয়া ভাষার বিকাশের পথে স্বভাবতই সহায়ক হয়; কিন্তু বিগতকালে দুইটি ভাষার সম্পর্কে অপরূপ অবস্থাগতিকে বাঙ্গালীদের বসবাস অসমীয়াদের নিকট বিরক্তিকর বোধ হইয়াছে। ইহা অসমীয়াভাষীদের মনে বাংলাভাষী ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও অসদ্ভাব জাগ্রত করিয়াছে।

সরকারী ভাষার প্রশ্নে আপত্তি

সরকারী ভাষার প্রশ্নে যে বিবাদ বাঁধে, তাহাতে কেবল বাংলাভাষীগণই আপত্তিকারী ছিলেন, এমন নয়। পাহাড়ীয়া লোকেরাও আপত্তি করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহারাই প্রধান ও তীব্রতর আপত্তির রব তুলিয়াছিলেন। অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণার বিরুদ্ধে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলাভাষী সম্প্রদায়, কোন আপত্তি উথাপন করেন নাই। কেবল যে জেলা প্রধানত বাংলাভাষী, সেই কাছাড় জেলার বাংলা-ভাষীগণ আপত্তি উথাপন করেন। কিন্তু সে আপত্তি অসমীয়া ভাষার বিরুদ্ধে নহে। তাঁহাদের দাবী মাত্র এইটুকু ছিল যে, অসমীয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও, সরকারী ভাষা বলিয়া পরিগণিত হউক।

পার্বত্য জাতিদের আপত্তি মৌলিক

কিন্তু পার্বত্য জাতিদের আপত্তি গুরুতর ছিল। অসমীয়া ভাষা অন্যতম সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তিত হউক, ইহা স্বীকার করিতেও তাঁহারা গররাজি ছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পার্বত্য জাতিদের আপত্তি অপেক্ষা বাংলাভাষীদের আপত্তিতেই অসমীয়াভাষীগণ অধিক বিচলিত হইলেন। কেন এরূপ হইল? ইহার কারণ এই যে, অসমীয়া ভাষার কোন কল্যাণ সাধিত হয়, বাঙ্গালীরা তাহার বিরোধী, এরূপ একটি ধারণা অসমীয়াভাষীদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

একথা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই কারণে অসমীয়াভাষীদের বিরাগ আরও বাড়িয়া গেল। আবার কলিকাতার সংবাদ-পত্রসমূহের মধ্যে কয়েকটি যখন আসামের ভাষার প্রশ্নে বাংলাভাষীদের পক্ষ লইয়া দাঁড়াইল, তখন অসমীয়াভাষীদের ভাবাবেগ উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই কারণেই, মে মাসের শেষের দিকে, অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া

গণ্য করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, শিলঙএ যে শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয়, তাহার সব কিছু দোষ বাংলাভাষীদের উপর আরোপ করা হয়।

শিলঙের শোভাযাত্রায় পার্বত্য জাতিরাই মুখ্য

আমার জানা সংবাদ যদি ঠিক হয় তবে, ঐ শোভাযাত্রা প্রধানত পার্বত্য জাতিদের ব্যাপার ছিল। মুষ্টিমেয় জনকয়েক বাঙ্গালী উহাদের সঙ্গে ছিলেন। কোন দায়িত্বশীল বাঙ্গালী নেতা ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দেন নাই। শোভাযাত্রায় একটি অতি আপত্তিকর শ্লোগান দেওয়া হইয়াছিল আর শোভাযাত্রার মধ্যে 'অসমীয়া ভাষা গাধার ভাষা' এই উক্তি লেখা পোষ্টার লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। যে শোভাযাত্রায় অন্যান্য লোকের সঙ্গে, যত অল্প সংখ্যক হউক, কিছু বাংলাভাষী ছিলেন, সেই যাত্রায় এরূপ ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ায়, অসমীয়াভাষীদের মনে কিরূপ তিক্ত ভাব জাগিতে পারে, তাহা অনুমান করা যায়। এই সবের ফলে ভাষা আন্দোলন ক্রমশ জোরদার, ব্যাপক, তীব্র ও তিক্ত হইয়া চলিল।

বাঙ্গালী সভায় শোভাযাত্রার ধ্বনির নিন্দা

যাহা হউক উক্ত শোভাযাত্রার পরদিন, শিলঙ-এর বাংলাভাষী সম্প্রদায় একটি সভা ডাকিয়া, শোভাযাত্রায় উক্তরূপ ধ্বনির নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন বলিয়া জানিতে পারি। কিন্তু অসমীয়া সংবাপত্রগুলি এই খবর মোটে প্রকাশই করিলেন না।

তীব্রতর পৃথক অন্তঃপ্রবাহ

পূর্বাপর কতকগুলি ঘটনা, যাহা আন্দোলনকে প্রভাবিত করে এবং যাহা উহাতে বিশেষত্ব দান করে, সেই ঘটনাবলীর পটভূমিকা সহ ভাষা আন্দোলনকে বিচার না করিলে, আমরা বাস্তব অবস্থা যথাযথ ভাবে অনুধাবন করিতে পারিব না। এরূপ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, ভাষার প্রশ্নটি কেবল উপরের স্তরের প্রবাহমাত্র এবং উহার অধঃস্তরে তীব্রতর পৃথক প্রবাহ বিদ্যমান এইরূপ প্রতিভাত হইবে।

সরকারী চাকরি

বাঙ্গালীরাই যে সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অগ্রণী হন, ইহা জানা কথা। সেই কারণে আসাম ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশ, যেগুলি তখন বঙ্গদেশের সহিত একত্র গ্রথিত অংশরূপে শাসিত হইত, সে সকল অঞ্চলে সরকারী চাকরিতে এবং বিদ্যাগত বৃত্তিগুলিতে বাঙ্গালীরা স্বভাবতই মুখ্য স্থান লাভ করেন। তবে স্থানীয় লোকের মধ্যে ক্রমশঃ ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং জনপ্রতিনিধি-মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর, প্রদেশের রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী-দের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যার অনুপাত কমিতে থাকে।

তাহার ফলে, বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বাঙ্গালীদের সংখ্যা প্রায় ধর্তব্য নহে, এরূপ শোনা যায়। বরং ব্রহ্মপুত্র বা আসাম উপত্যকায় বাংলাভাষীগণের অভিযোগ এই যে, উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন হইলেও, তাঁহাদের প্রার্থীরা রাজ্যদপ্তরসমূহে চাকরির কোন সুযোগ পান না বলিলেই চলে। বলা হয় যে রাজ্যদপ্তর সমূহে কর্মী নিয়োগের জন্য আসাম সরকার প্রতিযোগিতামূলক কোন পরীক্ষার আয়োজন করেন নাই। পদস্থ রাজকর্মচারীদের কথা ধরিলে, তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীদের সংখ্যা খুবই কম, যদিও লোকের ধারণা ইহার বিপরীত। একটি রাজনৈতিক দলের সাময়িক পত্র হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :

বাঙ্গালী চাকুরিয়া খুব কম

"পণ্ডিত নেহেরুও ধরিয়া লইয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা সরকারী চাকরিগুলি প্রায় একচেটিয়া দখল করিয়া রাখিয়াছে।

আসাম সিভিল সার্ভিস ১নং গ্রেডে, ১৪৫ জন অফিসারের মধ্যে, ১৮ জন বাংলাভাষী, ১৭ জন পার্বত্যজাতিভুক্ত, বাকী ১১০ জন অসমীয়া।

আসাম সিভিল সার্ভিসের জুনিয়ার ২নং গ্রেডে, ১৪৯ জন অফিসারের মধ্যে, ১৫ জন বাঙ্গালী, ১৪ জন পার্বত্য জাতি, বাকি ১২০ জন অসমীয়া।

আসাম সেক্রেটারিয়েট-এ, ১৪ জন সেক্রেটারীর মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র ১ জন।

১২ জন ডেপুটি কমিশনর ও এস. পি.-দের মধ্যে, বাঙ্গালী ডেপুটি কমিশনর মাত্র ১ জন, ও এস. পি. ২ জন ;

৪ জন ডি. আই. জি.-র মধ্যে, মাত্র ১ জন বাঙ্গালী।

বিচার বিভাগীয় উচ্চ পদে বাঙ্গালী কেহই নাই।

এক দিকে এই চিত্র, অপর দিকে, এমন কি ১৯৫১ সালের সেন্সাস মতেও, আসামের সমগ্র জন-সংখ্যার পঞ্চমাংশ বাঙ্গালী, সেই মতে তাহারা সরকারী পদগুলির শতকরা ২০টি পাইবার ন্যায়ত অধিকারী।"

এই পরিসংখ্যানগুলি সঠিক কি না তাহা যাচাই করা চাই।

কোম্পানীর চাকরি

কিন্তু আসামে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ ও অফিসগুলিতে বাংলাভাষীদের সংখ্যার আজও প্রাধান্য আছে। বিশেষত রেলওয়ে এবং আর. এম. এস.-এ একথা প্রযোজ্য। আর. এস. এন. ও আই. জি. এন. ষ্টীমার কোম্পানীতে বাংলাভাষী চাকুরিয়া বেশী।

কিন্তু পোষ্ট অফিসগুলিতে শুনিলাম যে অসমীয়াভাষীদেরই প্রাধান্য, বাংলাভাষীদের নয়। যেমন ধরুন, গৌহাটী পোষ্ট অফিসে, মোট বড় ছোট ১৮২ জন কর্মচারীর মধ্যে, মাত্র ১৪।১৫ জন বাঙ্গালী। অন্যান্য পোষ্ট অফিসে, বিশেষত আসাম উপত্যকার অবস্থাও অনুরূপ।

ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের কাছে শুনিয়াছি যে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন অসমীয়া-ভাষী প্রার্থী পাওয়া গেলে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় অফিসগুলিতে বিশেষ করিয়া রেলওয়ে ও আর. এম. এস. এবং ষ্টীমার কোম্পানীতেও, গত কয়েক বৎসর যাবৎ, মুখ্যত অসমীয়াভাষীদিগকেই নিয়োগ করা হইতেছে।

বলা হয় যে (কতদূর সত্য জানি না) অসমীয়াভাষী চাকুরিয়ারা ঐ রাজ্যের

বাহিরে বদলি হইতে সাধারণত অনিচ্ছুক। রেলওয়ে ও আর. এম. এস. চাকরিতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন অসমীয়া প্রার্থীরা যথেষ্ট সংখ্যায় অগ্রণী হন না, ইহা তাহার অন্যতম কারণ।

চা-বাগানের চাকরি

আসামে কম বেশী এক হাজার চা-বাগান আছে। আসাম বিধান সভার এক বিরোধী দলের নেতার কাছে জানিলাম যে, চা-বাগানগুলির অফিসার ও কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই অসমীয়াভাষী।

এমতাবস্থায় বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, সরকারী বিভাগ ও দপ্তরের চাকরিতে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে বাঙ্গালীদের প্রাধান্যের কথা এক্ষণে অলীক ও অবাস্তব। উহা অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। এই বিষয় নিরপেক্ষ অনুসন্ধান দ্বারা বর্তমান অবস্থার তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং জনসাধারণকে উহা জ্ঞাত করা, একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ অসত্য বা ভ্রান্ত খবর এবং লোকের খেয়াল খুশিমত নানা আজগুবি আন্দাজ ও জল্পনা কল্পনার আসর চলিবে এবং উহার দ্বারা সৃষ্ট বিরোধী ধারণা বলবৎ থাকিয়া গিয়া, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসদ্ভাব জাগাইয়া রাখিবে।

ভ্রান্ত ধারণা নিরসন

এই সম্পর্কে যদি কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকে তবে অচিরে তাহার নিরশন চেষ্টা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় চাকরিগুলিতে এবং বেসরকারী কোম্পানীগুলিতে চাকরির ব্যাপারে অসমীয়াভাষীদের নিয়োগের অনুপাত রক্ষায় সুবিচার করা ও ভবিষ্যতেও ঐ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে, রাজ্য সরকারের চাকুরির ক্ষেত্রে বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের যে অভিযোগ, তাহা যথার্থ দেখা গেলে, উহারও প্রতিবিধান হওয়া চাই।

সংবিধানের ১৬ (৩) ধারা মত আইন চাই

আমার মনে হয় সংবিধানের ১৬(৩) ধারা মত পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের

যোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঐ আইন অক্ষরে অক্ষরে ও আন্তরিকতার সহিত যাহাতে প্রতিপালিত হয়, ভারত সরকারের তাহা দেখা চাই। উহাতে উভয় সম্প্রদায়ের উপকার হইবে এবং এই সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব নিবারিত হইবে।

সে যাহাই হউক, অসমীয়াভাষীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া ছাত্র ও যুব-সমাজের মধ্যে এই মনোভাব দেখা যায় যে, বাঙ্গালীরাই কাজকর্মের মোটা অংশ বে-আইনী ভাবে দখল করিয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে বেকার সমস্যার উহাই একমাত্র কারণ।

নবনির্মিত গৌহাটী তৈলশোধনাগারে উপদ্রব

গৌহাটীতে নব-নির্মিত তৈলশোধনাগারে গত এপ্রিল মাসে যে উপদ্রব হয়, ছাত্র ও যুবকদের এই মনোভাবই উহার কারণ বলা হইয়া থাকে। সেখানে নাকি কয়েক জন ছাত্র ও যুবক কর্তৃক জেনারেল ম্যানেজার (যিনি ঘটনাচক্রে বাঙ্গালী) ও কয়েকজন কর্মচারী আক্রান্ত ও প্রহৃত হন। জুলাই মাসে যে অশান্তি ঘটে তাহারও কারণ ঐ মনোভাবই বলা হয়।

বেকার সমস্যা

অসমীয়াভাষী যুবকদের মধ্যে ব্যাপক বেকার সমস্যা, ও সেই কারণে তাহাদের নৈরাশ্য, এই সব বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়া থাকে। এই বিষয়েও যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত এবং তথ্য বিষয়ে যদি কোথাও ভুল ধারণা থাকে, তবে তাহার নিরাকরণ হওয়া উচিত। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আসাম বিধান সভার জনৈক প্রভাবশালী সদস্য আমাকে যে কথা বলেন তাহা উল্লেখ করিতেছি। আশা করি তিনি আমার এই উল্লেখের ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

তাঁহার মতে শিক্ষিত অসমীয়াভাষী যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রায় নাই বলিলেই চলে।

"আণ্ডার ম্যাট্রিক পাস্‌ড্"

তবে এক শ্রেণীর বেকার যুবক আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও বৃহৎ। তাঁহাদিগকে তিনি "আণ্ডার ম্যাট্রিক পাস্‌ড্" এই আখ্যা দিয়া বিশেষিত করেন। অফিসে চাকরি বা অন্য কোন ভাল চাকরি করিবার মত শিক্ষালাভ তাঁহাদের হয় নাই, তথাপি সেই সব ভাল চাকরি পাইবার উচ্চাশা তাঁহারা পোষণ করেন। সহজেই তাঁহারা উত্তেজিত হন। তাঁহাদের উচ্চাশা চরিতার্থ হইবার পথে বাঙ্গালীরাই অন্তরায় হইয়া আছেন, নিজেদের বুদ্ধিতে বা অপরের উস্কানিতে তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

বাংলাভাষী সম্প্রদায়েরও মত এই যে, বর্তমানে শিক্ষিত অসমীয়া যুবকদের মধ্যে নৈরাশ্যের বাস্তবিক কোন কারণ নাই। তথাপি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা অসমীয়া যুবকদের মনে অহেতুক নৈরাশ্যের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে।

বৃত্তির ক্ষেত্রে ঈর্ষা

আসাম বিধান পরিষদের জনৈক অকংগ্রেসী সদস্য, যিনি সদ্ভাবনার জন্য সর্বজনমান্য, তিনি আমাকে বলেন যে ওকালতি, ডাক্তারী, প্রভৃতি বিদ্যাগত বৃত্তিগুলিতে, ঈর্ষার মনোভাবও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে অসদ্ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। বিদ্যাগত বৃত্তিতে নিযুক্ত অভিজ্ঞ ও কৃতী ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। নবীন অসমীয়া সহকর্মীগণ তাঁহাদিগকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। উক্ত বক্তা বলেন যে, বৃত্তিধারী এই সব নবীনদের মধ্যে এরূপ একটি প্রচ্ছন্ন মনোভাব আছে যে, এই সব অভিজ্ঞ বাঙ্গালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোন প্রকারে সরাইয়া দিতে পারিলে, বৃত্তিতে উন্নতি করিবার অবাধ সুযোগ তাঁহাদের মিলিয়া যাইবে।

এই মন্তব্য কত দূর সত্য তাহা আমার জানা নাই।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা

শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয় যে বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অসমীয়া ছাত্রদের

মন তিক্ত করিবার অন্যতম কারণ হইল ঈর্ষা। পরীক্ষাসমূহের ফলাফল লক্ষ্য করিলে অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। এ বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন (স্কুল ফাইমাল) পরীক্ষার ফলাফল তালিকায় দেখা যায় যে, প্রথম ১০টি স্থানের মধ্যে, ৭টি স্থানই বাংলাভাষী ছাত্রেরা অধিকার করিয়াছে।

ব্যবসা বাণিজ্যে

অসমীয়াভাষীগণ এখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক ভাবে আত্মনিয়োগ করেন নাই। পাইকারী কারবার অধিকাংশই মাড়োয়ারীদের হস্তগত হইয়া আছে। মাঝারী কারবারগুলি অধিকাংশ বাঙ্গালী বা অন-অসমীয়াদের হাতে। ছোট কারবারীরা বেশীর ভাগ বাঙ্গালী। কামরূপ জেলায় কিছুকাল যাবৎ অসমীয়া-ভাষী সম্প্রদায়ের কিছু লোক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

অপ্রিয় সত্য

অত্যন্ত দ্বিধাকুণ্ঠিত চিত্তে, একান্ত অনিচ্ছার সহিত, এই সব অপ্রিয় বিষয় আমাকে উল্লেখ করিতে হইতেছে। কিন্তু এগুলি যদি উল্লেখ না করি, তবে যিনি আসামের অবস্থা গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে চাহিবেন, তিনি ন্যায়চিন্তাপরায়ণ অসমীয়া ভদ্রলোকদেরও মনের গতি কিরূপ, তাহার চিত্র যথাযথ দেখিতে পাইবেন না। এই সবের জন্য আশা করি লোকে আমাকে মার্জনা করিবেন।

শরণার্থী সমস্যা

কোন কোন অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীরা পতিত জমি কিনিয়া লন। এই সকল জমি লাভজনক চাষাবাদের প্রায় অযোগ্য, স্থানীয় অসমীয়াগণ এরূপ মনে করিতেন। কিন্তু নবাগত শ্রমশীল কৃষকেরা তাঁহাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এইসকল জমি উদ্ধার করিয়া এগুলিকে উর্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই জমিতে তাঁহারা দুই তিনটি ফসল ফলাইয়া

থাকেন এবং অসমীয়াগণ তাঁহাদের উৎকৃষ্ট জমি হইতে যে পরিমাণ আয় করেন তদপেক্ষা অধিক আয় করিতেছেন। এই ঘটনাকেও নবাগত বাঙ্গালীদের প্রতি অসমীয়াদের ঈর্ষার একটি কারণ বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে।

ভূমি সমস্যা

অসমীয়াদের মনে ভূমি সমস্যা বিষয়ে অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি করা হইয়াছে। এরূপ অভিযোগ করা হয় যে, স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গের শরণার্থী আগমনের ফলে, সমতল অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীরা চাষের জমি সংগ্রহের ব্যাপারে দারুণ অনটনের মুখে পড়িয়াছেন। আসামের সমতলভূমিতে কৃষি-নির্ভর জনসংখ্যার চাপ পশ্চিমবঙ্গের মতই গুরুতর বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এরূপ দৃষ্টি যে নির্ভুল, আমি তাহা মনে করি না। অথচ এই কারণে আসাম উপত্যকায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গের শরণার্থীরা তদঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত আগন্তুক রূপে পরিগণিত হন। এই মনোভাব অশান্তি সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে এরূপ বলা হইয়া থাকে।

জনসংখ্যার চাপ

আসামের সমগ্র আয়তন ৮৫,০১২ বর্গমাইল। উহার মধ্যে নেফা (নর্থ ইষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী) সহ পার্বত্য অঞ্চল ৬১,৬৭৯ বর্গমাইল। ১৯৫১ সেন্সস্ মতে, সমগ্র আসামের জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ ৪৩ হাজার। পার্বত্য অঞ্চলের জনসংখ্যা ১৭·৫ লক্ষ, অর্থাৎ সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল আয়তনে আসামের ৭২·৯ শতাংশ, কিন্তু উহার জনসংখ্যা সমগ্রের ১৩·৭ শতাংশ মাত্র। হিলস্ ডিভিসনের মধ্যে, ৩৪,৯৬৯ বর্গমাইল বিস্তৃত নেফা অঞ্চল, কেন্দ্রীয় সরকারের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে চলে। নাগা পাহাড় সহ স্বায়ত্বশাসিত পার্বত্য জেলাগুলির আয়তন ২৭,০১০ বর্গমাইল। পার্বত্য জেলাগুলিতে জেলা পরিষদগুলি জমিজমার উপর সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন। বাহিরের লোকের সেখানে জমি কিনিবার সম্ভাবনা নাই বলা

যায়। অতএব পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে, আসামের আয়তন ২৩,০৩৩ বর্গমাইল, অর্থাৎ ১ কোটি ৪৮ লক্ষ একর, এবং উহার জনসংখ্যা ৭৩ লক্ষ। অতএব সেখানে মাথা পিছু ২'৩৫ একর ভূমি আছে। সেইস্থলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ১ কোটি ৯৬ লক্ষ একর, আর ১৯৫১ সেন্সস মতে জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ, অর্থাৎ মাথাপিছু ভূমি হইল ০'৭৯ একর। এই মতে আসাম সমতল অঞ্চলে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ, পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু ভূমির তুলনায়, প্রায় তিনগুণ।

কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার চাপ

১৯৫১ সেন্সস মতে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৪২ লক্ষ, এবং রিসার্ভ বনভূমি বাদ দিয়া সমগ্র কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৭৪ লক্ষ একর। (ব্যক্তিগত বনভূমিসমূহ এক্ষণে সরকার নিজ মালিকানায় লইয়া 'রিসার্ভ ফরেষ্ট' বলিয়া রক্ষা করিতেছেন।) অতএব কৃষিতে নির্ভরশীল লোকদের মাথা পিছু গড়ে ৫২ শতক (০'৫২ একর) জমি আছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির উপর জনসংখ্যার চাপ প্রতি বর্গমাইলে ১,২২০ জনের কম নয়।

বিভ্রান্তিকর তথ্যাদি

আসামের উপদ্রব সম্পর্কে "আসাম—হার পিপ্‌ল্ এণ্ড ল্যাংগোয়েজ" (আসাম—উহার জনগণ ও ভাষা) নামে শ্রী কে. সি. বড়ুয়া প্রণীত, যে একখানি পুস্তিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে উক্ত জনসংখ্যার চাপ প্রতি বর্গমাইলে ৬৫০ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তথ্য ঠিক নয়।

ঐ পুস্তিকায় আসাম সমতল অঞ্চলে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার চাপ প্রায় ৬০০ এরূপ অনুমিত হিসাব ধরা হইয়াছে। হিসাবের ঐ সংখ্যাটিও নির্ভুল নহে। আসামের সমতল অঞ্চলে কৃষিজমির উপর জনসংখ্যার চাপ প্রতি বর্গমাইলে ৬০০র চেয়ে অনেক কম। নিম্নের তথ্যসমূহ হইতে ইহা প্রতিভাত হইবে :—

(১) খণ্ডজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ও ব্লকসমূহের অন্তর্গত ৬,১০০ বর্গমাইল পরিমিত ভূখণ্ড ঐ হিসাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অথচ ঐখানকার জনসংখ্যা বাদ দেওয়া হয় নাই।

(২) ১৯৫১ সেন্সাস মতে আসাম সমতল অঞ্চলের কৃষিনির্ভর জনসংখ্যা ৫৫ লক্ষ ৮১ হাজার, অথচ পুস্তিকায় ৭০ লক্ষ, এই ভুল সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

(৩) কর্ষণযোগ্য ভূমির সমগ্র পরিমাণ হিসাব করিবার সময় রিসার্ভ ফরেষ্ট (সরকার সংরক্ষিত বনভূমি) অধিকারভুক্ত বলিয়া কথিত ৫,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি বাদ দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে লক্ষ্য করা উচিত যে, গত বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সমগ্র ভূমির ৪০ শতাংশ বনভূমি এলাকায় ছিল, কিন্তু গত যুদ্ধের সময় অনেক বনরাজি বিনষ্ট হয়, এবং বর্তমানে সমগ্র ভূমির ১২·৭ শতাংশ মাত্র রিসার্ভ ফরেষ্টের অধিকৃত। বাকী পূর্বেকার বনানী অধিকৃত (২৭·৩ শতাংশ)। জমি ক্রমশ উদ্ধার করিয়া চাষ আবাদ করা হইতেছে। অতএব ঐ অংশকে বাস্তবিক চাষযোগ্য জমি বলিয়া ধরা উচিত।

নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান চাই

যাহা হউক পার্বত্য অঞ্চল, সমতল অঞ্চল এবং খণ্ডজাতি এলাকাগুলির পৃথকভাবে, প্রয়োজনীয় তথ্যমূলক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানাদি পাওয়া যায় না, তাই আসাম রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংখ্যার চাপ কত, তাহার নির্ভুল হিসাব করা যায় না। তবে উপরিউক্ত তথ্যগুলি হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খণ্ডজাতি এলাকা ছাড়িয়া দিয়া, অন্য সমতল অঞ্চলেও চাষযোগ্য জমির উপর কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার চাপ পুস্তিকায় লেখা ৬০০ অপেক্ষা অনেক কম।

আসামের জমি বেশ উর্বর

আবার আসামে চাষযোগ্য জমিগুলি সাধারণত বাংলার চাষজমির চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে, শস্য উৎপাদনের দিক দিয়া আসামের এক বিঘা জমি পশ্চিম বঙ্গের দুই বিঘা জমির সমান। তাহা ছাড়া

সমগ্র আসামে কর্ষিত জমির পরিমাণ মোটামুটি ৬২ লক্ষ ১০ হাজার একর। সমগ্র আয়তনের তুলনায় কর্ষিত জমির অংশ পার্বত্য অঞ্চল অপেক্ষা সমতল অঞ্চলে বেশী ইহাতে সন্দেহ নাই। আসামের মধ্যে সমতল অঞ্চলের আয়তন সমগ্রের ২৭ শতাংশের কিছু বেশী। অতএব সমতল অঞ্চলে কর্ষিত ভূমি সমগ্র কর্ষিত ভূমির ২৭ শতাংশের, অর্থাৎ ১৬ লক্ষ ৭৬ হাজার একরের, বেশী হইতে পারে না। এই কর্ষিত জমি ছাড়া কিছু জমি নিশ্চয় অনাবাদী থাকে, এবং আরও অন্য আবাদযোগ্য জমি পতিত হইয়া আছে। কিন্তু উল্লিখিত পুস্তিকাটিতে বলা হইয়াছে যে রাজ্যের সমগ্র সমতল অঞ্চলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৬৫ হাজার ৮ শত একর (খণ্ডজাতি এলাকায় ৩৩,৯২৪ একর, তাহার বাহিরে ৩১,৯১২ একর).। এই অঙ্ক যে অতিশয় কম করিয়া ধরা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভূমিহীনতার বৃথা আতঙ্ক

বৃথা আতঙ্ক লোকমনে কিভাবে সৃষ্টি করা যায়, ইহা তাহার একটি জলন্ত উাহরণ। পুস্তিকাতে একথাও বলা হইয়াছে যে সমতল অঞ্চলে ১২ লক্ষ স্থানীয় অসমীয়া আছে যাহারা একেবারে ভূমিহীন। কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সস রিপোর্ট (ভলুম ১, ইণ্ডিয়া, ইকনমিক টেবল্‌স—জেনারেল পপুলেশন পৃ ৮)-এ আমরা দেখিতে পাই যে আসামের সমতল ভাগে ভূমিহীন কৃষক ও তাহাদের পোষ্যদিগের মোট সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার। তাহাদের মধ্যে খণ্ডজাতি এলাকায় বাসিন্দা কত জন তাহা জানা নাই। তবে একথা জানা যে সমতল অঞ্চলের খণ্ডজাতির লোকেরা অধিকাংশই ভূমিহীন এবং ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বেশ মোটা অংশ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুর দল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ভাগচাষী। পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের অধিকাংশই আবার ছোট ছোট ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে।

ভূমিহীনদের মধ্যে সাধারণ অসমীয়াদের সংখ্যা খুব কম, একথা বলিলে

[illegible] কথা। খণ্ডজাতি এলাকাসমূহেও অধিকাংশ জমি অসমীয়াভাষী সম্প্রদায়ের হাতে।

কৃষিজোতের সীলিং আইন

এই প্রসঙ্গে ১৯৫৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ আসাম ফিক্সেশন্ অফ্ সীলিং অন্ এগ্রিকালচর ল্যাণ্ডহোল্ডিং (১৯৫৫) এক্ট্ (কৃষিজোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারক আইন) এর ধারাসমূহ লক্ষ্য করা উচিত। উহার ধারা মতে একটি পরিবার ধানচাষের জন্য ৫০ একর (১৫০ বিঘা) পর্যন্ত জমি রাখিতে বা কিনিতে পারে (অবশ্য অন্যান্য প্রকারের অনির্দিষ্ট পরিমাণ জমি রাখিবার পরও)। আসাম সমতল অঞ্চলে চাষজমির অভাব যতটা দেখান হইয়াছে ততটা যে নহে তাহা আইনের এই ধারাতেই সূচিত হইতেছে।

মৌরসীপাট্টা কেবল স্থানীয় অধিবাসীদের

আবার ১৯৫১ সেন্সস্-এর পূর্বে আসাম সরকার এই নিয়ম জারী করেন যে স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া অপর কেহ কেনা জমিতে মৌরসী বা দীর্ঘমেয়াদী পাট্টা পাইবে না, এক বৎসরের জমা বন্দোবস্ত লইয়া তাহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

স্থানীয় অধিবাসী অর্থাৎ অসমীয়াভাষী

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছয়টি জেলা সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসী বলিতে শুধু অসমীয়াভাষীদেরই বুঝিতে হইবে। বাংলাভাষীগণের অভিযোগ হইতেছে যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আগত বাঙ্গালী মুসলমান বাসিন্দারা বাংলাভাষী হওয়া সত্ত্বেও, এই নিয়মের ভয়ে নিজদিগকে অসমীয়াভাষী বলিয়া লিখাইয়াছে।

ভূমিস্বত্বলাভে বাংলাভাষী কার্যতঃ বঞ্চিত

তদবধি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলাভাষী হিন্দু বাসিন্দারা কার্যতঃ জমিতে স্থায়ী স্বত্বলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছেন। তাঁহারা বলেন

যে জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের ন্যায্য পরিমাণ ভূমির চেয়ে তাঁহাদের মালিকানাভুক্ত ভূমি অনেক কম। জনগণের বিভিন্ন অংশের হাতে কি পরিমাণ জমি আছে তাহার তথ্যাদি সংগৃহীত হওয়া উচিত।

ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য চা-বাগানগুলির উদ্বৃত্ত ৯.৫ সাড়ে নয় লক্ষ একরজমি সরকার নিজ হাতে লইয়াছেন।

বিতরিত জমি ভূমিহীনরা পায় নাই

অন্যান্য উর্বর পতিত জমিও সরকার বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু অভিযোগ হইতেছে যে সরকারের বিলিকৃত জমির অধিকাংশই বাস্তবিক ভূমিহীন চাষীদের হাতে যায় নাই। যে কোন পথেই হউক বিতরিত জমি উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসমীয়াভাষী ভদ্রলোকদের হাতে পড়িয়াছে। অতএব আসাম সমতল-ভাগে আজও কৃষিনির্ভর ব্যক্তিদের অনেকে যে ভূমিহীন রহিয়াছেন তাহার যথার্থ কারণ কি তাহা বুঝিতে গেলে, পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের সরকার বুঝি কিছু জমি দিয়াছেন এবং শরণার্থীদের আগমন আজও চলিতেছে, এই কথার মধ্যে ঐ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ঐ কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই 'অন্যত্র' খুঁজিতে দূরে যাইতে হয় না।

পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের আরও অধিক সংখ্যায় আসামে আসিতে দেওয়া হউক ও তাহাদের চাষের জমি দেওয়া উচিত, আমি এরূপ কথা বলিতে চাই না। উপরের তথ্যগুলির উল্লেখ সে দৃষ্টিতে নহে। আমার বক্তব্য হইল, কৃষিভূমি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশে প্রচারিত শংকাজনক উক্তিসমূহ গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতির সম্পর্কের ঘোর অনিষ্ট সাধন পূর্বকালেও করিয়া থাকিতে পারে এবং বর্তমানেও স্বস্থানচ্যুত ব্যক্তিদের মানসিক পুনর্বাসনের পথে ঘোর অনিষ্ট করিতে পারে।

ভাগচাষের পদ্ধতি

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও উল্লেখ করা উচিত। আসামে চাষাবাদ

ক্ষেত্রে দুই প্রকারের ভাগচাষ বা বাঁটাইদারী পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটিতে ভাগচাষী, বর্গাদার অথবা বাঁটাইদারকে জমির ফসলের অর্ধেক মালিককে দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মালিককে বিনামূল্যে বীজ, হাল ও বলদ যোগাইতে হয়, অধিকন্তু তাহার প্রাপ্য ফসল কাটিবার খরচও বহন করিতে হয়। অপর পদ্ধতির নাম চুকানি, তাহাতে ভাগচাষীকে বিঘাপ্রতি দুই মণ ধান মালিককে দিতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হাল, বলদ, বীজ ইত্যাদি চাষের ও ফসল কাটার সব কিছু খরচ ভাগচাষীর এবং শেষ অবধি ফসল না পাওয়া গেলেও সে কিছু ছাড় পায় না।

ভাগচাষীর ভূস্বর্গ

বিঘাপ্রতি ধানের ফসল সাধারণত ১০ মণ। অজন্মা খুব কম হয়। আসামে ভাগচাষীরা যে সকল সুবিধা ভোগ করে তাহা বাংলা দেশে কল্পনাও করা যায় না। পশ্চিম বাংলায় ভাগচাষ সম্পর্কে আইনে যাহাই লেখা থাকুক না কেন, কার্যক্ষেত্রে উহার বিধান প্রায়ই পালিত হয় না। ইহার ফলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভূমিহীন চাষীরা স্বভাবতই আসামকে ভাগচাষীর ভূস্বর্গ রূপে দেখিয়া থাকে।

আসামে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়াভাষীদের অনেকেই নিজ জমি খাস চাষ করা ছাড়িয়া দিতেছেন এবং ক্রমশ অধিক জমি ভাগচাষে দিতেছেন। চাষ চরিতে ইচ্ছুক অসমীয়াভাষী ভাগচাষীদের সংখ্যা ক্রমশ কমিতেছে। অতএব একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, অসমীয়ারা চাহেন বা না চাহেন, নিরাপত্তার পরিবেশ পাইলে ভবিষ্যতেও বাহিরের ভূমিহীন চাষীরা আসামের দিকে অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট হইবে।

আর্থিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য

আসামের বাংলাভাষী শিক্ষিত শ্রেণী এইরূপ অনুভব করিতেছেন যে, আসামে উপদ্রব ঘটিত বিপদে বাহিরের লোকেরা তাহাদের প্রতি কোন সহানুভূতি

প্রদর্শন করিতেছেন না। ইহার কারণ, বাহিরের লোকেদের অনেকের মনে এই ধারণা রহিয়াছে যে অন্যান্য অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাভাষীরা অসমীয়াদের শোষণ করিয়া থাকেন। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বাহিরের লোকদের মনে এইরূপ ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়াছেন। বাংলাভাষীরা চাহেন যে, এই বিষয়ে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান আদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত, যাহাতে এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হইতে পারে। প্রামাণ্য কোন পরিসংখ্যান না থাকায় পূর্বে যে সাময়িক পত্রের উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে আর একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

শিল্পপতি কাহারা

"আসামের প্রধান শিল্পগুলির নির্ঘণ্ট ধরা যাক্। গুরুত্বে সর্বপ্রধান শিল্প অবশ্য পেট্রোলিয়ম। সকলেই জানেন এই শিল্প সরাসরি ব্রিটিশ কর্তৃত্বে চালিত।

কয়লা শিল্পে ৪টি প্রধান কোম্পানীর মধ্যে ৩টির মালিক মাড়োয়ারী, ১টির ব্রিটিশ।

"সবশুদ্ধ প্রায় ৩০০ চাউল কল এবং তৈল কল আছে তন্মধ্যে ৩৫টির মালিক অসমীয়া, ৩২টির বাঙ্গালী, এবং বাকি ২৩৩টির মালিক মাড়োয়ারী।

"সমগ্র আসামে কন্ট্রোলের জিনিষপত্রের লাইসেন্সধারীদের এবং গুদামের মালিকদের মধ্যে ৪ জন অসমীয়া, ২ জন বাঙ্গালী, আর বাকী ১৪৪ জন মাড়োয়ারী।

"আসামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাগানচাষের উৎপন্ন দ্রব্য অবশ্য চা। চায়ের কারবার ২৫টি এজেন্সী কোম্পানীর হাতে। এগুলির মধ্যে ছোট ছোট ৩টি বাঙ্গালীদের, ১টি অসমীয়াদের এবং বাকি ২১টি ব্রিটিশ ও মাড়োয়ারীদের হাতে।"

সরকারী ভাষা না রাজ্য ভাষা ?

আমার মনে হয় আর একটি বিষয় আসামের অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বিষয়টি হইল এই যে 'সরকারী' ভাষা এই কথাটির ঠিক অর্থই বা কি এবং উহার ব্যঞ্জনাই বা কতদূর—সে সম্বন্ধে লোকমনে ভ্রান্ত ধারণা। আসামে পৌঁছান অবধি কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলের কাছে সর্বত্র শুনিয়া আসিতেছি যে 'রাজ্যভাষা' লইয়া এই বিরোধ। সংবাদপত্রগুলিও এই ভুল শব্দ প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছে। অথচ সংবিধান-এর ৩৪৫ ধারা মত রাজ্যের পক্ষে যাহা নির্ণয় ও ঘোষণা করিবার কথা তাহা হইল "রাজ্যের সরকারী ভাষা বা ভাষাসমূহ"—তাহা "রাজ্যভাষা" নহে।

রাজ্যের সরকারী ভাষা বলিতে অর্থ এই বুঝায় যে, রাজ্যসরকারের সরকারী কাজকর্ম যে ভাষায় চলা উচিত, অর্থাৎ সেই ভাষা (বা ভাষাসমূহ) যাহাতে সরকার ও উহার ব্যবস্থাপকবর্গ সেক্রেটারিয়েট, প্রদেশ, জেলা ও নিম্নস্থ দপ্তরসমূহে বা বিধান পরিষদ প্রভৃতিতে কাজকর্ম চালাইবেন।

সরকারী ভাষা ঘোষণার ফলে ঐ রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য ভাষার নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবার অধিকার কোনপ্রকারে ব্যাহত হইবে না। উহার দ্বারা ঐ রাজ্যে অন্য ভাষাভাষী অধিবাসীরা নিজভাষায় কথাবার্তা বলা বা ছেলেমেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ায় অধিকার সংকোচের কোন ব্যাপার নাই।

সংবিধান মতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চলিবে

বরং সংবিধানমতে রাষ্ট্রপতির উপর এই কর্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে যে, রাজ্য মধ্যে সরকারী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষাভাষী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে দিবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। কিন্তু "রাজ্যের সরকারী ভাষা" এইরূপ শব্দ প্রয়োগের পরিবর্তে "রাজ্যভাষা" শব্দটি আসামে ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে এবং সংবাদপত্রসমূহে ব্যাপক

প্রয়োগের ফলে অসমীয়া জনসাধারণের মনে সরকারী ভাষার বিহিত অর্থ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

তাঁহারা এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন যে অসমীয়া ভাষা যখন সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তখন বাংলাভাষী অধিবাসীদের তাহাদের ছেলেমেয়েদের বাংলাভাষায় শিক্ষা দিবার অধিকার আর থাকিবে না, তাহারা প্রকাশ্যে মাতৃভাষায় কথা বলিতেও পাইবে না।

বাঙ্গালীদের আশংকা

অসমীয়াভাষীদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণার প্রসার দেখিয়া বাংলা-ভাষীদের মনে এই আশংকা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে যে, অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হইলে অসমীয়াভাষীগণ বাংলাভাষীদিগকে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে দিবেন না এবং তাঁহাদিগকে বাংলায় কথাবার্তা বলিতে পর্যন্ত দিবেন না।

আশংকা অমূলক নহে

এই আশংকা যে অমূলক নহে তাহা হাঙ্গামার ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে। হাঙ্গামার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রাথমিক, মধ্য, এবং উচ্চ, সকল বাংলা স্কুল-ঘরগুলিই অগ্নিসংযোগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। ঐ সব লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবার অব্যবহিত পরে সকল বাংলা স্কুলের সম্পাদকদিগের নামে বেনামী চিঠি পাঠান হয়। চিঠিগুলিতে ভয় দেখানো হইয়াছিল যে, যদি এত কাণ্ডের পরেও তাঁহারা এই সব স্কুল পুনরায় চালু করিবার দুঃসাহস দেখান, তবে তাঁহাদের ভয়াবহ পরিণাম ঘটিবে। কয়েকস্থানে ইহাও দেখা যায় যে বাংলাভাষীরা একটি বাংলা স্কুল চালাইতেছেন, ইহাই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাগের একমাত্র কারণ।

বাংলা কথা শুনিলেই ক্রোধ

এই সেদিন কামরূপ জেলায় আমাদের শান্তি মিশনের একটি কর্মকেন্দ্রে

জনৈক বাঙ্গালী শান্তি সেবক বাস্-এ ভ্রমণ করিতেছিলেন। জনৈক সহযাত্রীর সঙ্গে তিনি বাংলায় কথা বলেন। ইহাতে অপর এক জন যাত্রী রাগান্বিত হইয়া বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। বড় হাঙ্গামা ঘটিবার তিন মাসেরও অধিক কাল গত হইবার পরও সম্প্রতি নওগাঁ জেলায় লংকা গ্রামে একটি বাঙ্গালী জুনিয়ার হাইস্কুল-এর বাড়ী রাত্রিকালে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হয়। ঐ অগ্নিসংযোগের জন্য এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়ের অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগ আছে। কিন্তু আমার মনে হয় আসামে ভাষা আন্দোলনের আসল সমস্যা কোথায় তাহার নির্ভুল ইঙ্গিত এই ঘটনা হইতে পাওয়া যায়।

বাংলা স্কুলের প্রতি বিষম রাগ

বাস্তব ক্ষেত্রে হাজার হাজার বাংলাভাষী গৃহস্থ অধ্যুষিত দূর অভ্যন্তর গ্রামাঞ্চলে, মিডল স্কুলের ত কথাই নাই, বাংলা প্রাথমিক পাঠশালার সংখ্যাই নিতান্ত অল্প। আবার তাহার মধ্যে সরকারী সাহায্য বা উৎসাহপুষ্ট এবং স্থানীয় অসমীয়াভাষীদের সস্নেহ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বাংলা স্কুলের সংখ্যা আরও কম।

শিক্ষার বাহনরূপে বাংলাভাষা থাকিবে কি

অতএব প্রশ্ন এই যে যদি সরকারী ভাষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অসমীয়া ভাষীদের মন হইতে বিদূরিত হইয়া যায় এবং যদি অসমীয়া ভাষাই একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহা হইলেও বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলাভাষা কোন নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইতে দিতে তাঁহারা রাজী হইবেন কি? একটি বামপন্থী দলের মুখ্য নেতৃস্থানীয় সদস্যের সহিত এই বিষয়ে আমি আলোচনা করি। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়া তাঁহারা কি পরিণতি লাভ করিতে চাহেন তাহা জানিতে চাই, এবং এই প্রশ্নের সরল উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ জানাই।

সর্বত্র অসমীয়া ভাষা চাই!

তিনি অকপট ভাবে আমাকে জানাইলেন যে, আসাম উপত্যকায় কি সরকারী কি বেসরকারী, সকল কার্যক্ষেত্রেই একমাত্র অসমীয়া ভাষা প্রচলিত হউক, ইহাই তাঁহারা চাহেন।

আমরা একথা ধরিয়া লইতে পারি যে সরকারী ভাষার ভূমিকা কি তাহা অন্তত আইন ব্যবসায়ীদের অজ্ঞাত নহে। এক্ষেত্রেও শিক্ষিত অসমীয়াভাষীদের বাংলাভাষা সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার আর একটি নজীর দেখা যায়। আসাম উপত্যকার কোন একটি আদালতে উকিলদের মুহুরীরা বাংলাভাষী সম্প্রদায়-ভুক্ত। সেখানকার অসমীয়াভাষী উকিলেরাও বাংলা জানেন, বাংলা বলিতে পারেন।

বাংলা কথা বলা চলিবে না!

কিন্তু ঐ মুহুরীদিগকে বার লাইব্রেরী হলঘরের মধ্যে কাহারও সহিত বাংলায় কথা বলিতে দেওয়া হয় না। আসাম বিধান সভায় সরকারী ভাষা বিল গৃহীত হওয়ার দিন কয়েক পরে জনৈক বাংলাভাষী মুহুরী অনবধানবশত বারলাইব্রেরীর মধ্যে কাহারও সহিত কথাবার্তায় কয়েকটি বাংলা কথা উচ্চারণ করিয়া ফেলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত জনৈক অসমীয়া উকিলের উহা কর্ণগোচর হয়। উক্ত বিদগ্ধ উকিল মহাশয় নাকি মুহুরীটিকে তাহার দুঃসাহসের জন্য তৎক্ষণাৎ ভৎর্সনা করেন, এই অভিযোগ শোনা গিয়াছে। ভাষা সমস্যা (সরকারী ভাষা সমস্যা নহে) সম্পর্কে আসাম উপত্যকায় বাতাস কোন দিকে বহিতেছে, এই সকল ঘটনা হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বাঙ্গালীর আভিজাত্যবোধ

আসামে বাংলাভাষী বাসিন্দাদের অসমীয়াভাষী ভায়েদের প্রতি মনোভাব কেমন, সে সম্পর্কে অনেক কথা উঠিতেছে। আভিজাত্যের অভিমান বশে তাঁহারা অসমীয়াভাষীদের হীন চক্ষে দেখেন, এরূপ অভিযোগ করা হয়। রাজ্যের

বাহিরের কোন কোন দায়িত্বশীল লোককে হাঙ্গামার প্রসঙ্গ এরূপভাবে উল্লেখ করিতে শোনা যায় যে, তাহাদের কথায় মনে হয় তাহারা যেন বাংলাভাষীদের তথাকথিত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অশান্তিকর ঘটনাবলীর পরোক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

বাঙ্গালীর ত্রুটি বিচ্যুতি

সম্প্রদায় রূপে বাঙ্গালীদের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয়ে আমি অচেতন নহি, বিশেষত সামাজিক ক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাংলাভাষীদের সম্পর্কে আসামে যে ধূয়া উঠিতেছে তাহা আমার কাছে অতীত যুগের স্লোগান-এ পরিণত হইয়া গিয়াছে। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে বাঙ্গালীরাই সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে অগ্রণী হন এবং চাকরি ও বিদ্যাগত বৃত্তিগুলি একচেটিয়া করেন। সে সময়ে অসমীয়াভাষী ভায়েরা সেই শিক্ষায় অনগ্রসর থাকিয়া গেলেন। সে যুগে তাঁহারা অবশ্য কোন এক প্রকারের শ্রেষ্ঠতামূলক মনোভাব পোষণ করিতেন।

শ্রেষ্ঠতাভিমান কেবল বাঙ্গালীর নহে

কিন্তু এই দোষ কেবল বাঙ্গালীদের বিশেষত্ব নহে। গোড়ার দিকে সারা ভারতে ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই দোষ দেখা দিয়াছিল। আমার মনে হয় আজও সকল প্রদেশের ইংরেজী শিক্ষিতের মধ্যে এই দোষ কিয়ৎ পরিমাণে বজায় আছে। কিন্তু সেকালের পর আসামে বাস্তব পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার

অসমীয়াভাষী নরনারী উভয়ের মধ্যেই ব্যাপক ভাবে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে। আধুনিক হালচালে তাঁহারা যথেষ্ট অভ্যস্ত হইয়াছেন। হয়ত বা তাঁহারা তাঁহাদের অঞ্চলের বাংলাভাষী শিক্ষিত প্রতিবেশীদের অপেক্ষা এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। সুদূর অভ্যন্তর গ্রামাঞ্চলেও দেখিয়াছি শোভন পরিচ্ছদে সজ্জিত গ্রামের মেয়েরা ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত হাইস্কুলের পথে দলে দলে হাঁটিয়া চলিয়াছে।

পট পরিবর্তন

আসাম উপত্যকার অভ্যন্তরে বর্তমানে বাংলাভাষী অধ্যুষিত গ্রামে ইহার বিপরীত চিত্র আমি বর্ণনা করিতে পারি। ২০ ধৎসর পূর্বে আসাম উপত্যকার অধিবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদের সংখ্যা সামান্ত ছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে লোক আগমনের ফলে উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেশ খণ্ডিত হইবার পর এবং স্বাধীনতা লাভের পর লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আসিয়া ঐ অঞ্চলে বসতি করিয়াছে। তাহারা অধিকাংশ কৃষক, কারিগর এবং দোকানী।

বাংলা পাঠশালা নাই

অনেক স্থানে ইহারা শত শত পরিবার বসবাস করে অথচ সেখানে একটিও বাংলা প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত নাই। পাছে অসমীয়া প্রতিবেশীদের অসন্তোষভাজন হইতে হয় এই আশংকায় তাহারা নিজেরা বাংলা স্কুল খুলিতে সাহস পায় না।

নূতন হরিজন ?

এই সব পরিবার তুলনায় গরীব আর অসমীয়া প্রতিবেশীগণ তাহাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাহারা অবাঞ্ছিতের মত অনাদরে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য ছেলেমেয়েদের অসমীয়া প্রাথমিক পাঠশালায় পড়িতে পাঠায়। বাল্য বয়সের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত হওয়া উচিত, এই শিক্ষা-সূত্রটি জগতের সর্বত্র স্বীকৃত একটি সিদ্ধান্ত। যে সম্প্রদায় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় তাহার গুণগত অবনতি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবনত পর্যায়ে পতিত বাঙ্গালী পরিবার গোষ্ঠিকে আসামে অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অসমীয়াদের পূর্ণ সন্তোষ কোথায়

আসামে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রাহিয়াছে। যদি আসামে বাঙ্গালী বাসিন্দারা সকল কাজকর্মের ব্যাপারেই অসমীয়া ভাষা গ্রহণ

করেন তবে তাহাতেও অসমীয়া প্রতিবেশীগণ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইবেন কি? এমন অনেক বাঙালী আছেন যাঁহারা আসাম উপত্যকায় দীর্ঘকাল পূর্বে বসতি স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা অসমীয়ায় কথা বলেন, শিক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের অসমীয়া স্কুলে দেন, বাড়ীতে ছাড়া বাংলা কথা বলেন না এবং অসমীয়া প্রতিবেশীদের সহিত বিশেষ সৌহার্দের সম্পর্ক আছে।

অসমীয়াভাষী বাঙ্গালীদেরও রেহাই নাই

কিন্তু হাঙ্গামার সময় তাঁহাদিগকেও ত রেহাই দেওয়া হয় নাই। কেন এমন হইল? যে সব সভায় আমি বক্তৃতা করিয়াছি তাহার কয়েকটিতে দায়িত্বশীল অসমীয়া ভদ্রলোকেরাও বক্তৃতা করেন। এই বক্তারা বাংলাভাষী ভাইদের অসমীয়া ভাইদের বিশ্বাস অর্জন করিতে হইলে কিরূপ আচরণ করা বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন।

কিরূপ আচরণ বাঞ্ছনীয়

তাঁহারা বাংলাভাষীদের সমক্ষে তেজপুরের ত্রিপাঠী ও আগরওয়ালা এই দুইটি পরিবারকে অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে তুলিয়া ধরেন। এই পরিবার-দ্বয়ের পূর্বপুরুষেরা অসমীয়া মেয়েদের বিবাহ করেন এবং উঁহাদের বংশধরেরা সম্পূর্ণরূপে অসমীয়া হইয়া গিয়াছেন। বাংলাভাষীরা ঐরূপ হইতে চাহেন বা না চাহেন, প্রশ্ন হইল বর্তমান কালে ঐরূপ রূপান্তর কি যুক্তিযুক্ত?

সম্পূর্ণ রূপান্তর কি সম্ভব

ইহা জাতিতত্ত্বের প্রশ্ন। প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের এত বিকাশ ছিল না। সেই কারণে তখন দুই পৃথক জাতি বা বর্ণের লোক ঘটনাচক্রে পাশিপাশি বসবাস করিতে থাকিলে উভয়ে সহজে মিশিয়া এক জাতি হইয়া যাইত। সে সময়ে যখন এক জাতির লোক অপর এক জাতির লোকের দেশে গিয়া পড়িয়া সেখানে বসতি করিত তখন তাহাদের পৃথক ভাষা,

আচার ও জীবনধারা অবিকৃত রাখা সম্ভব হইত না। তখন যোগাযোগের কোন সহজ ব্যবস্থা ছিল না এবং তাহাদের পূর্বেকার দেশীয় আত্মীয়স্বজনের সহিত কোন যাতায়াত বা অন্য সম্পর্ক রাখার কোন সুযোগ ছিল না। সেইজন্য তাহারা নূতন দেশের লোকেদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়া অভিন্ন এক মিশ্র জাতিতে পরিণত হইত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

কিন্তু বর্তমান যুগে যখন বিজ্ঞানের এত বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে, যখন সহজেই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে স্থল, জল ও অন্তরীক্ষের পথে ভ্রমণ করা যায়, যখন সারা পৃথিবী জুড়িয়া ডাক ও তার ব্যবস্থার বিস্তার ঘটিয়াছে, যখন মুদ্রিত পুস্তক, রেডিও প্রভৃতি উপকরণ জুটিয়াছে, তখন বিভিন্ন জাতির লোকেদের এক জাতিতে মিলিয়া যাওয়া সোজা ব্যাপার নহে।

যোগাযোগের নানা উপায়

ধরুন জন কয়েক গুজরাটী ভদ্রলোক উড়িষ্যায় আসিয়া বসতি করিয়াছেন। তাঁহারা সহজেই মধ্যে মধ্যে গুজরাটে যাতায়াত করিতে পারেন। তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনও উড়িষ্যায় আসিয়া তাঁহাদের অতিথি হইতে পারেন। ডাক, তার, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে গুজরাটে আত্মীয়স্বজনের সহিত তাঁহারা নিত্য যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারেন। গুজরাট হইতে তাঁহারা সহজেই গুজরাটী পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি নিয়মিত পাইতে পারেন। তাঁহারা ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং গুজরাটবাসী তাঁহাদের স্বঘরের কুটুম্বদিগের সহিত ছেলেমেয়েদের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে পারেন। তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ সামাজিক এবং ধার্মিক আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করিতে পারেন।

জাতিতে জাতিতে মিশিয়া যাওয়া সম্ভব নহে

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ইংলণ্ডে এই সেদিন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। এমতাবস্থায় বর্তমানে জাতিতে জাতিতে মিশিয়া যাওয়া সম্ভব হয় না। অতএব উল্লিখিত গুজরাটীদের উড়িয়াদের সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া পাকাপাকি উড়িয়াতে রূপান্তরিত হওয়া সহজ ব্যাপার হইবে না। এক্ষণে এইরূপ জাতিমিশ্রণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের সকল লোকের সমগ্র ভাবে নহে।

ব্যক্তিগত জাতিমিশ্রণ সম্ভব

প্রধানত বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ঐরূপ ব্যক্তিগত জাতিমিশ্রণ আজিকার দিনে ঘটিতে পারে। ধরুন জনৈক উড়িয়া যুবক একটি গুজরাটী কন্যাকে বিবাহ করিল। এইরূপ ক্ষেত্রে উড়িয়া বরটি গুজরাটী আচার অনুষ্ঠান গ্রহণের দিকে ঝুঁকিতে পারে অথবা গুজরাটী বধূটি উড়িয়া আচার অনুষ্ঠানাদির দিকে ঝুঁকিতে পারে। কে কোন দিকে ঝুঁকিবে তাহা উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। পিতা অথবা মাতার অধিক তেজস্বী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাহাদের সন্তান উড়িয়া অথবা গুজরাটী হইয়া বাড়িয়া উঠিবে।

সন্তান তেজস্বী পক্ষের অনুসরণ করে

উড়িয়া পিতার ব্যক্তিত্ব গুরুতর এবং স্বভাব তেজস্বী হইলে সন্তান উড়িয়া হইবে নচেৎ গুজরাটী মাতার ব্যক্তিত্ব গুরুতর ও স্বভাব অধিক বেগবান হইলে সে গুজরাটী হইবে।

অতএব আধুনিক যুগে প্রতিবেশী বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মিশ্রণে একীকরণের কল্পনা করা নিরর্থক। পুরাকালে জাতি মিশ্রণে একীকরণই মন্ত্র ছিল। আধুনিক যুগের মন্ত্র হইল একই রাজ্যে বা উহার অংশবিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিতে সহ-বসতি এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের ঐক্য সাধনা।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য

এক কথায় আজিকার দিনের মন্ত্র হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা।

বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, পাশাপাশি বাস করিয়া পরস্পরের ধর্ম, ভাষা, জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, আচার, অনুষ্ঠান, ইত্যাদি সম্পর্কে সমান শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিবে। পরস্পরের প্রতি তাহারা প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করিবে। তাহাদের মধ্যে কোন উচ্চনীচ ভেদ ভাব থাকিবে না। কেহ কাহাকেও শোষণ করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে থাকিবে না। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির জীবনে বিবিধের মধ্যে মহা মিলন সাধন করিবার এইগুলি হইল আবশ্যিক অনিবার্য উপকরণ। ইহাই ভারতের স্বকীয় বিশিষ্ট মন্ত্র। ইউরোপে ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের সেখানে নিজস্ব একটি রাষ্ট্র হইয়াছে।

'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্'

কিন্তু ভারত একটি সুবিশাল দেশ। রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপের চেয়ে ইহার আয়তন বড়। ইহাতে ছোট বড় তিন শতের অধিক ভাষা আছে, তন্মধ্যে ১৪টি প্রধান ভাষা। তথাপি ইহা একটি দেশ এবং একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, কারণ ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে মহামিলন ও ঐক্য সাধনার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতের সংবিধান

সেই কারণে ভারতের সংবিধানেও এই বিধান দেওয়া হইয়াছে যে দেশের সকল নাগরিকের নিম্নরূপ অধিকার থাকিবে :

(১) সে দেশের সর্বত্র স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে পারিবে ;

(২) দেশের যে কোন অংশে অবস্থান বা স্থায়ী বসতি করিতে পারিবে ;

(৩) সেখানে সম্পত্তি অর্জন, ভোগ ও দান বিক্রয় করিতে পারিবে ;

(৪) এবং সেখানে কোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ, কোন কাজকর্ম ও ব্যবসা করিতে পারিবে।

ভারত যদি কখনও এই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে তবে তখন

ভারত জগৎকে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবে। কথিত আছে যে ইহাই ভারতের বিধিদত্ত নিয়তির বিধান।

সকল দেশের মানুষকে চরিত্র শিক্ষা দান

জগতের অন্যান্য দেশের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের নিয়তি কি হইবে, সে সম্বন্ধে মহর্ষি মনু তিন সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন ঃ

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ।"

অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের মানবকে চরিত্র শিক্ষা দান করাই ভারতের নিয়তি। এই নিয়তির দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা লাভের জন্য ভারত স্বয়ং চরিত্রের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে কি? আমার মনে হয় না যে, স্বাধীনতা লাভের পর এই তের বৎসরকালের মধ্যে ভারত এই দিকে বিশেষ কোন অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

আসাম ও অন্যত্র যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমাদের সকলের চোখ খুলিয়া যাওয়া উচিত। আসামে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি ভারতের যে কোন প্রদেশেই সংঘঠিত হইতে পারে। সর্বত্রই দাহ্য উপকরণসমূহ অল্পবিস্তর প্রস্তুত হইয়া আছে, আগুন লাগিলেই হয়।

আসাম হাঙ্গামার সময় পশ্চিমবঙ্গ যে সংযম পালন করিয়াছিল বলিয়া মনে করে, তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ গৌরব করিয়া থাকে। কিন্তু উহার পক্ষে ঐরূপ অহংকারের কোন হেতু নাই। কারণ আমার মনে হয়, আসাম হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ার দরুণ পশ্চিমবঙ্গে কি কি ঘটিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ লোক সে বিষয়ে অবহিত নহেন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া

শিলিগুড়িতে একজন অসমীয়া যুবক রেলকর্মী নিহত হন। তাহা ছাড়া আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং বাঁকুড়ায় প্রধানত মাড়োয়ারী

সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে আক্রমণ করা হয়। তিন ব্যক্তি নিহত হন, কয়েকজনকে মারধর করিয়া আহত করা হয়, কয়েকটি দোকানপাট লুণ্ঠিত হয় এবং কিছু সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়। তাহা ছাড়া উত্তরবঙ্গনিবাসী কয়েকজন অসমীয়া পুরোহিতকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়।

পুলিশ ও শান্তিকর্মীদের তৎপরতা

অবশ্য পুলিশ এবং শাসনকর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সহিত দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন এবং দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের প্রচেষ্টার দ্বারা অবস্থা তৎক্ষণাৎ আয়ত্তাধীনে আনা হয়।

বাঙ্গালীরা যেন এরূপ মনে না করেন যে, অসমীয়ারা মন্দ লোক, আর বাঙ্গালীরা ভাল। আবার অসমীয়ারাও যেন একথা মনে না করেন যে, বাঙ্গালীরা মন্দ লোক, আর অসমীয়ারা ভাল। ভারতের অপরাপর প্রদেশের লোকেরা যেন মনে না করেন যে, বাঙ্গালী ও অসমীয়ারা মন্দ লোক, আর তাঁহারা নিজেরা বড়ই ভাল।

কিভাবে সজ্জন হইতে হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলকেই এখনও অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই শিক্ষা যেন আমরা শীঘ্র গ্রহণ করি নচেৎ ভারত হয়ত খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

কেবল বাঙ্গালীরা অসমীয়া হউক, অপরে নহে!

বাঙ্গালী ছাড়া বাহিরের অন্যান্য লোকজনও আসামে আসিয়া বসতি করিয়াছেন, যেমন, মাড়োয়ারী, পশ্চিমা, উড়িয়া ইত্যাদি। অসমীয়াদের সহানুভূতি ও সম্প্রীতি আকর্ষণ করিতে হইলে উহাদিগকে পুরাপুরি অসমীয়া বনিয়া যাইতে হইবে—উহাদের নিকট অসমীয়ারা এরূপ প্রত্যাশা করেন এমন মনে হয় না। অথচ অসমীয়াদের অন্তত একাংশের মনে আসাম উপত্যকায় বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাক, এই প্রচ্ছন্ন মনোভাব রহিয়াছে কেন? এই মনোভাবের কারণ কি?

এই বিষয়টি লইয়া অনেক ভাবনা চিন্তা করিয়াছি। অসমীয়া ও বাঙ্গালী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ে মিল আছে। সম্প্রদায় হিসাবে তাহারা পরস্পর নিকট আত্মীয়ের মত। মাড়োয়ারী এবং বাহিরের অন্য বসতিকারীরা, সম্প্রদায় হিসাবে, অসমীয়াদের হইতে দূর ব্যবধানে রহিয়াছেন। মনস্তত্বের দিক দিয়া মানুষ নিকট আত্মীয়দের আরও নিকটে চায়, দূরবর্তী অনাত্মীয়দের সম্বন্ধে উদাসীন থাকে।

পৃথিবীর অভিমুখে গতিশীল বস্তু পৃথিবীর যত নিকটবর্তী হয় পৃথিবী উহাকে তত দ্রুততর গতিতে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। ইহাই মধ্যাকর্ষণ সূত্র। অনুরূপ কোন মনস্তত্ত্ব বাঙ্গালীদের সম্পর্কে অসমীয়াদের মনে হয়ত ক্রিয়া করিতেছে।

আসাম কেবল অসমীয়াদের

বাংলাভাষীরা অভিযোগ করেন যে অসমীয়াভাষীরা চাহেন যে আসাম কেবল তাহাদেরই খাস নিজস্ব হইয়া থাকুক অপর কাহারও নহে। বলা হয় যে এই মনোভাব নূতন নয়। ১৮৭৪ সালে আসাম যখন পৃথক একটি প্রদেশ রূপে পরিগণিত হয়, তখনই এই মনোভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল মনে হয়। পূর্বে 'আসাম' এই নামটিতে ব্রহ্মপুত্র বা আসাম উপত্যকার ছয়টি জেলাকে বুঝাইত। কিন্তু আসাম যখন ১৮৭৪ সালে চীফ্ কমিশনারের অধীনে একটি পৃথক শাসনাঞ্চল হইল তখন শ্রীহট্ট ও কাছাড় এই দুইটি বাংলা-ভাষী জেলা সমন্বিত সুরমা উপত্যকা অঞ্চলটিকে ঐ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীহট্টের পাকিস্তানভুক্তি

শ্রীহট্ট জেলা পূর্ববঙ্গে যাইবে কি না—এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য যখন ঐ জেলায় গণনির্দেশ লওয়া হয়, তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বরদলই মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে আসাম সরকার, শ্রীহট্ট জেলাকে ভারতে রাখিবার জন্য, আন্তরিক কোন চেষ্টা করেন নাই এবং ঐ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন

—এইরূপ অভিযোগ করা হয়। ঐ নিষ্ক্রিয়তার ফলে ভারত বিভাগের সময় চারিটি থানা ছাড়া সমগ্র শ্রীহট্ট জেলা পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সুরমা ভ্যালী গেলেও কিছু যায় আসে না

এমনও অভিযোগ করা হয় যে, সুরমা উপত্যকার বাকি অঞ্চলও যদি আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সে ঘটনাকে অসমীয়ারা গুরুতর কিছু মনে করিবেন না। এমন কি যদি পার্বত্য জেলাগুলি আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়, তাহাতেও তাঁহারা বিচলিত হইবেন না। অসমীয়া দৈনিক সংবাদপত্রগুলির আলোচনার ভঙ্গিমার মধ্যে এই অভিযোগের সমর্থন লক্ষিত হয়, এরূপ বলা হয়।

মহাত্মাজীর অভিমত

অসমীয়াভাষীদের তথাকথিত এইপ্রকার মনোভাবের সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী একবার মন্তব্য করেন :

> "আসাম কেবল অসমীয়াদেরই খাস সম্পত্তি—এই ভাবের যে মত প্রকাশিত হইতেছে তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। ভারতে যদি ঐরূপ মনোভাব প্রত্যেক প্রদেশে সঞ্চারিত হয় তবে তখন ভারত কাহাদের সম্পত্তি হইবে? সকল প্রদেশের লোকেরাই ভারতের লোক এবং ভারত ইহাদের সকলেরই দেশ।"

'বঙ্গাল খেদা' এই প্রথম নয়

গত জুলাই মাসের হাঙ্গামা বাংলাভাষীদের প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম ভয়াবহ অত্যাচার নহে। অনুরূপ উপদ্রব পূর্বে আরও দুইবার ঘটিয়াছিল। অত্যাচার সর্বপ্রথম দেখা দেয় ১৯৫০ সালে এবং দ্বিতীয়বার পুনরায় দেখা দেয় ১৯৫৫ সালে, ঐগুলি যদিও ক্ষুদ্রতর আকারে ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। আসাম কেবল অসমীয়াদের জন্যই—এই মনোভাবই ঐ বাহ্য উপদ্রব-

গুলির প্ররোচনা দিয়াছিল। এই অত্যাচার, লোকের মধ্যে 'বঙ্গাল খেদা' অর্থাৎ, আসাম হইতে বাঙ্গালী উৎখাত, এর আন্দোলন বলিয়া পরিচিত।

ছাত্র ও যুবকেরা অগ্রণী

ইহা প্রায় জানা ঘটনা যে, হাঙ্গামা সৃষ্টিতে ছাত্র ও যুবকেরা মুখ্য অংশ এবং অগ্রণী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্তা এই সব যুবজনেরা হাঙ্গামায় যে উক্তরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার উপযোগী মনোভাব কি কি কারণে পুষ্ট হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা যথাযথ অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত।

সাহিত্যের ভূমিকা

মনে হয় সাহিত্য এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রচনা করিয়াছে। অসমীয়া ভাষায় দুইটি বহুল প্রচারিত উপন্যাস আছে। একটি হইল 'হরোয়া স্বর্গ' (হারানো স্বর্গ) এবং অপরটি হইল 'মাটি কার'। প্রথমটি ১৯৫০ সালে রচিত। ইহার প্রথম সংস্করণ ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৫ সালে ইহার ২য় সংস্করণ বাহির হয়। ইহার লেখক হইলেন মহম্মদ পিয়ার। এই লেখক আরও নয়টি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

"হরোয়া স্বর্গ"

'হরোয়া স্বর্গ' (হারানো স্বর্গ) বইটির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এই যে, বাঙ্গালীরা বিশ্বাসঘাতক এবং মাড়োয়ারীরা শোষক। তবে বাঙ্গালীরা মাড়োয়ারীদের চেয়েও অধিক মন্দ, কারণ এতকাল আসামে বসবাস করিবার পরও, তাহারা বাঙ্গালী থাকিয়া গিয়াছে। তাহারা বাংলা স্কুল এবং বাঙ্গালী ক্লাব, ইত্যাদি চালাইয়া থাকে। অতএব বাঙ্গালীদের উপর প্রতিশোধ লইতে হইবে।

"মাটি কার"

দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাটি কার'। এটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। ছাপায়

এক বৎসরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়া যায় এবং ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার লেখক হইলেন হিতেশ ডেকা (ইনি আসামে সুপরিচিত ব্যক্তি।) এই বইটির বিষয়বস্তু হইল এই যে বাঙ্গালীরা শোষক এবং তাহারা আসামকে গিলিয়া খাইয়া ফেলিতেছে। সেই কারণে উপন্যাসটির নায়ক 'কনক' বাঙ্গালী বাসিন্দা এবং বাঙ্গালী শরণার্থীদের আসাম হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র করে এবং তাহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য একটি অনুচরদল গড়িয়া তোলে।

উপন্যাস বর্ণিত প্লান

যাহারা গত জুলাই মাসের হাঙ্গামা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা অনুভব করেন যে, উপন্যাসের ১৯শ অধ্যায় বর্ণিত প্লানটিকে অক্ষরে অক্ষরে মনে প্রাণে রূপায়িত করা হইতেছে। অনুচরবাহিনীর লোকেরা পার্বত্য অঞ্চলে সংগোপনে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছিল। তাহারা সমস্বরে একটি কোরাস গান গাহিত। গানটির ধূয়া এই :

"বঙ্গাল খেদা ভাই, বঙ্গাল খেদা
অসম দেশর পরা বঙ্গাল খেদা"

(ভাই সব বাঙ্গালীদের তাড়াও, আসাম দেশ হইতে বা ঙ্গালীদিগকে বাহির করিয়া দাও)

"আশীর্বাদ" : "আঁচানী"

তৃতীয় আর একটি পুস্তক আছে "আশীর্বাদ"। ইহা শ্রীপ্রেমনারায়ণ লিখিত ছোট গল্পের সংগ্রহ। ইহার প্রথম ও প্রধান গল্প হইল 'আঁচানী' অর্থাৎ পরিকল্পনা। একদিন সকালে জনৈক আইনজীবী তাহার পড়ার ঘরে মনোযোগ দিয়া কিছু লিখিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া, অত মন দিয়া তিনি কি করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। উকিল ভদ্রলোক একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতার পর স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি মস্ত বড় একটি

কাজে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অর্থাৎ 'বঙ্গাল খেদা আঁচানী' (বাঙ্গালী বিতাড়ণের পরিকল্পনা) এই নামে একটি মহান পরিকল্পনা তিনি রচনা করিতেছেন। এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে এবং পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৫৬ সালে। পুরস্কার ও লাইব্রেরীর জন্য পুস্তকটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

এত সব তথ্যাদি সম্মুখে রাখিয়া, আশা করি, এই সম্পর্কে আর কোন মন্তব্য করিবার প্রয়োজন হইবে না।

সরকারী ভাষা

আসাম রাজ্যের সরকারী ভাষা কি হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা আমার পক্ষে বড়ই কুণ্ঠার বিষয়, বিশেষতঃ যখন আসাম বিধান সভায় সরকারী ভাষা বিল গৃহীত হইয়াছে এবং রাজ্যপালের অনুমোদন অন্তে উহা আইনে পরিণত হইবে। সংবিধানের ৩৪৭ ধারামত রাষ্ট্রপতি যদি কোন হস্তক্ষেপ করেন, তবে তদনুসারে আইনের কিছু রদবদল হইতে পারে। আসামে যে সব সভায় আমি বক্তৃতা দিয়াছি তাহার কতকগুলিতে আমি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। অতএব এই বিষয়ে আমার মনে যে সব চিন্তা উঠিয়াছে সেগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের না জানাইয়া রাখা আমার পক্ষে উচিত হইবে না।

সংবিধানে ত্রুটি

ভারত ইউনিয়নের সরকারী ভাষা সংবিধানে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, অথচ রাজ্যের সরকারী ভাষা কি হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার, রাজ্য বিধান সভার বিচারের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যগুলির কোনটির কি কি সরকারী ভাষা হইবে ,তাহাও যদি সংবিধান পরিষদেই (কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লী) স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সংবিধানেই উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইত, তবে এখন ভাবিতেছি, কতই না ভাল হইত। সংবিধান রচয়িতারা যদি জানিতেন যে, এই প্রশ্নটি এতটা বাদবিসংবাদের বিষয় হইয়া উঠিবে এবং জনতার বিভিন্ন

অংশের মধ্যে এত তীব্র বিভেদ ও শত্রুতার ভাব জাগাইয়া তুলিবে যে তাহার সংঘাতে দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে, তবে তাঁহারা রাজ্য বিধান সভার বিবেচনার উপর এই প্রশ্ন ফেলিয়া রাখিতেন না। কিন্তু ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর মানুষের বুদ্ধির উদয় হয়। আবার একদিকে শত শত কথ্যভাষা সমন্বিত এই মহাদেশকে রাজকার্যে একভাষী করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, অপর দিকে রাজ্যগুলিকে সরকারী কাজে বহুভাষী করিবার স্থান সংবিধানের ধারাতেই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব বিভেদের বীজ সংবিধানের মধ্যেই প্রোথিত হইয়া আছে।

কোন নির্দিষ্ট সূত্র নাই

অধিকন্তু রাজ্যে সরকারী কাজে প্রযোজ্য একটি বা একাধিক ভাষা নির্ণয় করিবার কোন সূত্র বা নিয়মাবলী সংবিধানের মধ্যে বা অন্য কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা নাই। এমতাবস্থায় আজিকার ভাষা-সচেতনতার যুগে সরকারী ভাষা লইয়া যে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠির মধ্যে এমন তীব্র অমিল দেখা দিতেছে ইহাতে আশ্চর্য কিছু নাই।

অতএব এ বিষয়ে রাজ্যগুলির নিকট যুক্তি এবং পরিস্থিতিই অনন্য পথ-প্রদর্শকরূপে রহিয়া গিয়াছে। ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক লোক হিন্দী বলিতে বা বুঝিতে পারে, এই যুক্তিতে উহাকে ভারত ইউনিয়নের সরকারী ভাষা করা হইবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন রাজ্যে সরকারী কাজের জন্য যদি একটিমাত্র ভাষা রাখিতে হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এই সূত্রটিকে রাজ্যের সরকারী ভাষা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত বলিতে হইবে।

বহুভাষাভাষী রাজ্য

কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠে এই যে, যে রাজ্যে একাধিক কথ্য ভাষা প্রচলিত, সরকারী সকল প্রকার কাজে এবং ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে কাজের পক্ষে,

সেই রাজ্য একভাষিক হওয়া সুবিধাজনক হইবে কি? আমার মনে হয়, ভারতে শিক্ষা প্রসারের বর্তমান পর্যায়ে, সরকারী সকল স্তরে সর্বত্র একটি মাত্র ভাষা চালাইলে, অন্য ভাষাভাষী জনসাধারণের বিশেষ কষ্ট হইবে। কেন্দ্রীয় রাজকার্যে এবং রাজ্যের সরকারী কার্যে এই ব্যাপারে পার্থক্য আছে। ইউনিয়নের সরকারী ভাষার কথা ধরিলে, দূর পল্লী অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে ঐ ভাষার প্রায় কোন সম্পর্কই থাকে না। কিন্তু রাজ্যের সরকারী ভাষার ব্যাপার অন্যরূপ। পল্লীর জীবনযাত্রার দৈনন্দিন কাজকর্মেও আজ জনসাধারণকে নিত্য বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ও রাজকর্মচারীদের সংস্পর্শে আসিতে হয় এবং প্রয়োজনবশে তাহাদের সহিত যোগাযোগ ও আদান প্রদান করিতে হয়।

সকল স্তরে এক ভাষা চলিবে কি?

অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে একাধিক কথ্য ভাষা প্রচলিত সেখানে রাজ্য সরকারের কাজকর্মের সকল স্তরে একমাত্র ভাষা চালাইবার জন্য জেদাজেদি করা ঠিক নহে।

জেলার স্তরে সরকারী ভাষা

সেইজন্য আমার মনে হয় জেলা স্তর অবধি শাসন ব্যবস্থার সকল কাজে সেই অঞ্চলের প্রধান কথ্য ভাষাগুলি ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলা স্তর পর্যন্ত সরকারী কাজকর্মে অসমীয়ার সহিত বাংলা ভাষাকেও সরকারী ভাষা বলিয়া গণ্য করা উচিত, কারণ এই উপত্যকার ছয়টি জেলায় বেশ কিছু সংখ্যায় বাংলাভাষী বাসিন্দা রহিয়াছেন। এই সূত্র প্রদেশের সকল অংশে জেলা স্তর পর্যন্ত প্রয়োগ করা উচিত।

কিন্তু প্রাদেশিক স্তরে প্রশাসন ব্যবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যথার্থ কথা

বলিতে গেলে প্রাদেশিক স্তরে রাজনৈতিক অথবা ভাবাবেগজাত কারণ ব্যতীত অন্য কারণে দুই ভাষা বা বহুভাষার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না।

তিনটি সরকারী ভাষা হউক

আমি যতদূর জানি তাহাতে আমাদের দেশের একাধিক অবিসংবাদী নেতা ও নিরপেক্ষ মহান ব্যক্তি এই মত পোষণ করেন যে, আসামে প্রাদেশিক প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে তিনটি ভাষাকে সমান মর্যাদাযুক্ত সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকার করা উচিত। একথাও আমি জানি যে, কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নহেন এরূপ কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যে সকল ভাষা জনসংখ্যার কোন নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ, ধরুন ১০ বা ১৫ শতাংশ,-এর কথ্য ভাষা, সেই সব ভাষাগুলিকেই, আসামে এবং অন্যান্য রাজ্যে প্রাদেশিক সকল প্রকার রাজকার্যে সরকারী ভাষারূপে গণ্য করা উচিত।

তথাপি আমার অভিমত এই যে প্রাদেশিক স্তরে প্রয়োজনীয় রাজকার্যে প্রত্যেক রাজ্যে একটিমাত্র সরকারী ভাষা চলিত হওয়া উচিত।

সুইজারলণ্ডে ৪টি সরকারী ভাষা

সুইজারলণ্ডের মত ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রও বহুভাষাভাষী। সে দেশে চারিটি সরকারী ভাষা আছে। তবে আমার মনে হয়, বর্তমান অবস্থায় কোন রাজ্য বা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার স্বচ্ছন্দে বহুভাষী হইতে পারিবেন না। বহুভাষী হইতে পারিলেও হওয়া উচিত নহে। সরকারের বহুভাষা প্রচলন করিতে উপকরণ ও অন্য ব্যবস্থাদির জন্য এক্ষণে অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা উচিত নহে।

অসমীয়াই সরকারী ভাষা হউক

সেই কারণে আসামে সর্বাধিক লোক অসমীয়া বলে বা বুঝে বলিয়া অসমীয়াই একমাত্র সরকারী ভাষা হওয়া উচিত। এরূপ হইলে, ভাবাবেগ-

জনিত ক্লেশ ছাড়া, বাংলাভাষীদের অন্য কোন স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে না। বরং আমার মনে হয় বাংলাভাষীদের যথার্থ কল্যাণ ইহাতে অগ্রসর হইবে।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চাই

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, আসামে এবং বিশেষত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী বাংলাভাষীদের আসল সমস্যা হইল, তাহাদের পুত্রকন্যাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের অবাধ সুযোগ মিলিবে কি না, এবং তাহাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রকাশ্যে বাংলা কথাবার্তা বলা যাইবে কি না। বাঙ্গালীদের যদি আসাম উপত্যকায় বসবাস করিতেই হয়, তবে এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বাহির করিতেই হইবে। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যদি বাংলাকে অসমীয়ার সহিত সমপর্যায়ে সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলেও আমার আশংকা এই যে, উহাতে অবস্থার উন্নতি না হইয়া বরং মন্দের দিকে যাইতে পারে। অসমীয়াদের মন উহাতে আরও বিষাইয়া যাইতে পারে।

বাংলা অন্যতম সরকারী ভাষা হইলেও রক্ষা হইবে কি ?

বাংলা ভাষা অন্যতম সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষিত হইলেও, আসামে বাংলাভাষীদের শিক্ষা বাংলাভাষার মাধ্যমেই হইবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা উহাতে নাই। সংবিধানে ঐরূপ কোন রক্ষাকবচ দেওয়া নাই। সরকারী কার্যে নিযুক্ত রাজপুরুষদের, বিশেষ করিয়া অধস্তন কর্মচারীদের, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের উপর শেষ অবধি উহা নির্ভর করে।

পক্ষান্তরে যদি আসামে বাংলাভাষাকে একটি সংখ্যালঘু ভাষা বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে উহার স্বার্থ সংবিধানের ৩০ এবং ৩৫০ নং ধারামতে সংরক্ষিত হইতে পারে।

সংবিধানে বলিষ্ঠ রক্ষাকবচ চাই

কিন্তু সংবিধানের ঐ রক্ষাকবচ যথেষ্ট নয়। আমার মনে হয় বর্তমানে

দেশে যে অবস্থা চলিতেছে, তাহাতে সংখ্যালঘুদের ভাষার অধিকার রক্ষণার্থ সংবিধানের মধ্যে বলিষ্ঠতর রক্ষাকবচ সন্নিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য আমার মনে হয়, সংবিধানের ৩০নং ধারা সংশোধন করিয়া, ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘুদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র পাওয়া গেলে, ঐ ভাষার বিদ্যালয় স্থাপনের আশু কর্তব্যভার রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষভাবে ঐ ধারার মধ্যে নির্দেশ করিয়া দিতে হইবে। সংখ্যালঘুদের নিজস্ব ভাষায় স্কুল স্থাপনের অধিকারটুকুমাত্র দিয়া ছাড়িয়া দিলে, উহাতে উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সিদ্ধ হইবে না।

আমার মনে হয়, সমস্যাটির আর একটি দিক আছে যাহা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক হউক ভুল হউক, অসমীয়াভাষীরা মনে করেন যে, বাঙ্গালীরা তাহাদের ভাষার ক্ষতিসাধন করিয়াছে এবং অসমীয়া ভাষাকে তাহারা হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে। সরকারী ভাষার প্রশ্ন যখন প্রথম উঠে তখন বাংলাভাষী-দের শ্রেষ্ঠ সুযোগের ক্ষণটি আসিয়াছিল। তাঁহাদের সে সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সৌজন্যপূর্বক এই প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত ছিল যে, রাজ্য পর্যায়ে সরকারী ভাষা হইবার সম্মান একমাত্র অসমীয়া ভাষাকেই দেওয়া উচিত। উহাতে অসমীয়াদের মনের ক্ষোভ বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইত এবং উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধান ঘুচিয়া যাইত।

কনিষ্ঠা ভগিনীকে সম্মান

এইরূপ সৌজন্য প্রকাশের সুযোগ এখনও চলিয়া যায় নাই। বাংলা সাহিত্য অসমীয়ার তুলনায় অনেক বেশী বিকাশ লাভ করিয়াছে। আসামে বাংলা অবহেলিত হইলেও উহার অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে না। বয়ঃপ্রাপ্ত দিদিমণির পক্ষে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীকে জয়মাল্যলাভে সহায়তা করা এবং বাড়িয়া উঠিবার অবাধ সুযোগ দেওয়াই উচিত। পক্ষান্তরে বিশেষতঃ বাংলাভাষীদের বিরোধিতার সমক্ষেই শেষ পর্যন্ত যদি অসমীয়াকে একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণার বিলটি আইনে পরিণত হয়, তবে অসমীয়াভাষীদের ভুক্তমুখে তিক্ত স্বাদের রেশ থাকিয়া যাইবে।

অসমীয়াভাষীদের উদ্বেগ

যদি অসমীয়া ভাষাই শেষ অবধি আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা রূপে গৃহীত হয়, তবে উহাতে আসামের সরকারী ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নটির চিরতরে সমাধান হইয়া যাইবে কি ? অসমীয়াদের একাংশের মনে এই প্রশ্ন উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছে। গত সেন্সাসের ব্যাপারে, নবাগত বাঙ্গালী মুসলমানেরা যাহাতে অসমীয়াকেই মাতৃভাষা বলিয়া লিখায়, সে বিষয়ে যে অত আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, ইহাই তাহার কারণ। আগামী সেন্সাসের সময়েও অনুরূপ আগ্রহ প্রকাশ পাইতে পারে। শিক্ষিত অসমীয়াদের একাংশ, বঙ্গদেশ হইতে আরও অধিক জনসমাগমের সম্ভাবনা দেখিলে, ত্রস্ত ও ম্রিয়মান হন।

এইরূপ আতংক যদি থাকে, তবে অন্তত একটি কারণে, উহা আমার স্বাভাবিক মনে হইয়াছে। বাহিরের লোকেদের, বিশেষত বাঙ্গালীদের, আগমন যদি চলিতে থাকে এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে যদি আসামে বাংলাভাষীদের সংখ্যা অসমীয়াভাষীদের সমান বা অধিক হইয়া দাঁড়ায়, তবে সরকারী ভাষা আইনটি সংশোধন করিয়া, বাংলাকে একমাত্র সরকারী ভাষা অথবা অসমীয়ার সহিত সমপর্যায়ে অন্যতম সরকারী ভাষা করিবার আন্দোলন দেখা দিতে পারে।

আসামের মত ক্ষুদ্র প্রদেশ যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নসূত্রে বাহির হইতে ক্রমান্বয়ে ভিন্ন ভাষাভাষী লোক দলে দলে আসিতে থাকিবে, সেক্ষেত্রে এরূপ আশংকা অমূলক নয়। সমাগত অন্য ভাষাভাষী কোন দলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। তাহাদের এই আশংকা গঠনাত্মক পথে নিরাকরণ করা না হইলে বিভিন্নভাষী দলগুলির সহিতও তাহাদের বিদ্বেষভাব জন্মিতে পারে। অন্য কোন ছোট রাজ্য, যেখানে একাধিক কথ্যভাষা প্রচলিত, সেখানেও ভবিষ্যতে অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে।

সংবিধানে নূতন রক্ষাকবচ

সেইজন্য আমার মনে হইতেছে যে, সংবিধানে একটি সংশোধন দ্বারা নূতন একটি রক্ষাকবচ দেওয়া উচিত যে, আসামের মত রাজ্যে বুনিয়াদী ভাষার ন্যায্য অধিকার, বহিরাগত অন্যভাষাভাষীদের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইতে পারিবে না। অবস্থা পরিবর্তনের কারণে সংবিধানে এইরূপ একটি ধারা সংযোজনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

কোন কোন মহলে এই ধারণা ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছে যে, আসামে তাহাদের মৌলিক ভাষার অধিকার সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়া দিলেও, রাজনীতি-সচেতন অসমীয়াদের একদলকে সন্তুষ্ট করা যাইবে না।

রাজনৈতিক আধিপত্য

বলা হয় যে, এই সব রাজনীতিকরা অসমীয়াভাষী গোষ্ঠির হাতে প্রদেশের রাজনৈতিক আধিপত্য চিরকালের জন্য কায়েম রাখিতে চান। সেইজন্য তাঁহারা পার্বত্য অঞ্চল এবং কাছাড় পৃথক হইয়া যাক এরূপ চাহেন, এবং আসামে অন্যান্য ভাষাভাষী সংখ্যালঘু দলের চেয়ে বাংলাভাষীর সংখ্যা অধিক বলিয়া অপর বাঙ্গালীদের আগমন পছন্দ করেন না। দেশের অন্যান্য অংশে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হইবার পর তাঁহাদের এই মনোভাব একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। তাঁহাদের মনোগত ইচ্ছাকে কি ভাবে রূপায়িত করা যাইবে তাহা আমি বুঝি না। ভিন্ন একটি রাজ্য গঠন করিয়া পার্বত্য অঞ্চল পৃথক করা যাইতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানকে উপহার দেওয়া ছাড়া, কাছাড়কে কিরূপে পৃথক করা যাইবে? অতএব একই রাজ্যে বাংলাভাষী ও অপরাপর গোষ্ঠির সহিত শান্তিতে সহঅবস্থান করিবার নীতিটি মানিয়া চলা ছাড়া, অসমীয়া জনগণের আর কোন গত্যন্তর নাই।

বাঙ্গালী আধিপত্যের ভয় নাই

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের কারণে অসমীয়াদের ভীত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যাহারা বিশেষ কোন ভাষাগোষ্ঠির রাজনৈতিক আধিপত্যের দৃষ্টিতে চিন্তাভাবনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা জানিয়া স্বস্তিবোধ হইবে যে, বাঙ্গালীরা তাহাদের নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও, জাতি হিসাবে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একভাষাভাষী গোষ্ঠিরূপে একত্রে সংঘবদ্ধ-ভাবে চলিতে বা কাজ করিতে সহজাত স্বভাববশেই অপারগ। ভাব গতিতেই তাহারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অধিকন্তু রাজনৈতিক আত্মচেতনায় তাহারা অনেক অগ্রগামী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা যদি কোন কিছুর আনুগত্য স্বীকার করেন তবে, তাহা কোন সামাজিক অথবা সমাজ-রাজনীতিগত মতবাদ। একজন বাঙ্গালী স্বামী যদি কংগ্রেসী হন তবে তাহার বাঙ্গালী স্ত্রী সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট হইতে পারেন, অথবা ইহার ঠিক বিপরীতও হইতে পারে। কিন্তু এই মতপার্থক্যের কারণে তাহাদের ব্যক্তিগত ভালবাসা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। বাঙ্গালী পরিবারে এরূপ উদাহরণ দুর্লভ নহে।

ড্রাগনের দাঁত ঃ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় লিখিত 'ড্রাগনের দাঁত' প্রবন্ধটির উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী উত্থাপনে বাঙ্গালীরাই সর্বপ্রথম পথিকৃৎ হন এবং ১৯১২ সালে ঐ দাবী বলবৎ করিয়া নিজেদের ক্ষেত্রে ঐরূপ প্রদেশ গঠন করাইয়া লইতে সমর্থ হন। এরূপ অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত কি? ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কথাই যে অন্নদাবাবু বলিতেছেন তাহা সুস্পষ্ট।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন

বাঙ্গালীদের জন্য পৃথক প্রদেশ গঠন করিতে, বৃটিশ শাসকদের বাধ্য করাই, বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, একথা কি যথার্থ? বাঙ্গালীদের

উহাই লক্ষ্য হইলে, জাতীয়তাবাদী সমগ্র ভারতকে ঐ আন্দোলনে যোগ দিতে প্রোৎসাহিত করা যাইত কি? বাংলা দেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল সেই জাতীয়তাবাদক মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ শাসকেরা বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত করেন। ইংরাজের এই অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দেওয়াই এই আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল. অন্য কিছু নহে। তখন পর্যন্ত মাতৃভাষা-সচেতনতা ভারতের কোনও স্থানেই জাগ্রত হয় নাই। আবার বিহার অথবা উড়িষ্যাকে বাংলা হইতে পৃথক প্রদেশ করিয়া দিতে হইবে, বাঙ্গালীরা এরূপ কিছু দাবী করিয়াছিলেন কি?

ভারত বিভাগ

ঐ প্রবন্ধে আরও বলা হইয়াছে ১৯৪৭ সালে বাঙ্গালী হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য বঙ্গবিভাগ স্বীকার করিয়া পূর্ববঙ্গকে বলিদান করেন। এই উক্তি কি সত্য? সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তমত এই নীতি স্থির হয় নাই কি যে, সমগ্র বঙ্গকে পাকিস্তানের নিকট বলিদান অপেক্ষা বঙ্গবিভাগই বরং শ্রেয়? নিখিল ভারতীয় জনগণের তৎকালীন মনের গতির বিপরীত কোন কাজ বাঙ্গালী হিন্দুরা সেই সময়ে করিয়াছিলেন কি?

মুশলিম লীগের নীতি হইতেই বুঝা গিয়াছিল যে পাকিস্তান একটি অগণতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র, এমন কি একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মধ্বজী রাষ্ট্রস্বরূপ হইবে। বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে একমাত্র অন্য পন্থা ছিল সমগ্র বঙ্গদেশকে এমন একটি রাষ্ট্রের নিকট বলি দেওয়া, যাহা লোকের আশংকামত অগণতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্ররূপে প্রতিভাত হইতেছিল। এই কারণে বঙ্গের একাংশকে উহার গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাঙ্গালী যাঁহারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করিতে চাহেন তাঁহারা সেই অংশে বসবাস করিবেন। বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইহাই মুখ্য কারণ।

আত্মসমালোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। তবে ভ্রান্ত ধারণার বশে আত্ম-সমালোচনা করিলে ক্ষতি হয়।

জুলাই হাঙ্গামার লক্ষণ

জুলাইএর হাঙ্গামার সাধারণ লক্ষণগুলি ছিল এই, গৃহে অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তির ক্ষতি, বিনষ্টি বা লুঠতরাজ এবং মারপিট।

অর্গলহীন গৃহ

কুচবিহার জেলায় দুইবার পদব্রজে ভ্রমণকালে আমি জানিতে পারি যে, ঐ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে চুরির ঘটনা প্রায় নাই বলিলেই হয়। এই সেদিন পর্যন্ত লোকে বাড়ীঘরের দরজায় আগল দিবার কোন প্রয়োজন, এমন কি রাত্রেও, বোধ করিত না এবং অদ্যাবধি দুয়ারে অর্গল খুব কম লোকের ঘরেই আছে। এই বিষয়ে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা আমার জানা আছে বলিয়া আমি ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করি। তখন স্থানীয় লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনি কখনও আসামে গিয়াছেন কি?" আমি বলি "না"।

অসমীয়াদের মধ্যে চুরি নাই

তাঁহারা বলিলেন "আপনি যদি আসামের ব্যাপার লক্ষ্য করেন তবে আরও আশ্চর্যান্বিত হইবেন। অসমীয়ারা এত ভাল লোক যে তাহাদের মধ্যে কোন চোর নাই। সেখানে ভিখারীও নাই।" সেই অবধি আমার মনে অসমীয়া জনগণের সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা এবং তাহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমি ইহাও জানিতাম যে অসমীয়ারা, বিশেষত তাহাদের মেয়েরা কলারসিক।

জুলাই মাসের হাঙ্গামার সময় সাধারণত বাংলাভাষীদের গৃহে ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তবে কোন বাড়ী বা দোকান অবাঙ্গালী বাড়ীর সংলগ্ন হইলে অগ্নিসংযোগ হইতে রেহাই দেওয়া হয়, কিন্তু উহার আসবাসপত্র ভাঙ্গিয়া, নষ্ট করিয়া, অথবা লুট করিয়া লওয়া হয়। অগ্নিসংযোগ

হইতে রেহাইপ্রাপ্ত একটি দোকান ঘর, যাহা আমি প্রথম দেখি, তাহার সকল জিনিষপত্র ছিন্নভিন্ন বা বিনষ্ট করা হইয়াছে, দেখিলাম, কিন্তু বেশী কিছু সরান হয় নাই, মনে হইল।

আমি বলিয়া উঠিলাম "বেশ করিয়াছে। অসমীয়াদের নিকট ইহাই তো চাই।" আমি কি বলিতেছি, সঙ্গীরা তাহা বুঝিল না। আমি বুঝাইয়া বলিলাম "অসমীয়ারা রাগের মাথায় বাড়ীতে আগুন দিতে পারে, আসবাব পত্র ভাঙ্গিয়া তছনছ করিতে, সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কখন চুরি বা লুণ্ঠন করিবে না। ইহাই অসমীয়া চরিত্র।" কিন্তু পরে দেখিতে পাই, হাঙ্গামার সময় অনেক বাড়ীঘর, দোকানপাট লুণ্ঠিত হইয়াছে। অসমীয়া সঙ্গীরা আমাকে এই বলিয়া বুঝান যে, এই সব লুটপাট অসমীয়া নহে, অন্য দুষ্ট লোকদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে।

স্বভাবগত সদ্‌গুণের বিনাশ

কিন্তু হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের বক্তব্য ভিন্নরূপ ছিল। ক্রমশঃ উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরিয়া এমন সব স্থানে গেলাম যেখানে আক্রান্ত দোকান যে অসমীয়াদের দ্বারাই লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল। ইহাতে আমি বলি "ইহা অনসমীয়।" অবশেষে আমাদের একটি শান্তিসেবক কেন্দ্রে দেখিলাম, হাঙ্গামায় বিতাড়িত ব্যক্তিরা, যাহারা আশ্রয়-শিবির হইতে সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অভিযোগ করিলেন যে, হাঙ্গামার সময় তাঁহাদের গৃহে যে সকল অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহারা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অনেক কিছুই অসমীয়া প্রতিবেশীদের গৃহে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু আবার হাঙ্গামার ভয়ে ঐগুলি দাবী করিতে পারিতেছেন না। অধিকন্তু, পূর্বে অসমীয়ারা ঋণ অস্বীকার করিয়াছেন, এরূপ কখনও শোনা যাইত না, কিন্তু এখন অভিযোগ হইতেছে যে, হাঙ্গামার পর তাঁহারা অন্তত এই স্থানে, বাঙ্গালীদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ অস্বীকার করিতেছেন।

ইহা শুনিয়া এইরূপ একটি অনর্থকর উপদ্রবের সময়ে একটি সজ্জন গোষ্ঠির অতি উত্তম চরিত্রের কি ঘোর অধঃপতন ঘটিতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

হত্যাকাণ্ড

হাঙ্গামার ব্যাপারে এক একটি অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখা দেয়। জোড়হাট ও উহার পূর্বাঞ্চলে এবং ডিব্রুগড় মহকুমায় বাংলাভাষীদের প্রতি আক্রমণে, ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যা করাই উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়, যদিও নানা কারণবশত বাস্তবিক নরহত্যা খুব বেশী সংখ্যায় সংঘটিত হইতে পারে নাই। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে কয়েকটি অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়।

মেখলা পরিতে বাধ্য

ডারাং জেলার উত্তরাংশে এবং উত্তর লক্ষীপুর মহকুমায়, হাঙ্গামার এই বিশেষত্ব দেখা যায় যে, বাংলাভাষী মেয়েদের অসমীয়া পোষাক 'মেখলা' পরিতে বাধ্য করিবার অথবা তাহারা মেখলা পরিতে বাধ্য হয়, এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিবার, দিকে ঝোঁক দিল। অসমীয়াদের দ্বারা আয়োজিত শোভাযাত্রায় অল্প বা অধিক বয়স্কা, সকল বাংলাভাষী, মেয়েকেই মেখলা পরিচ্ছদে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইত। সহপাঠিনীদের অত্যাচার ও গঞ্জনার ভয় দেখাইয়া বাংলাভাষী ছাত্রীদিগকে স্কুল কলেজের ক্লাসে মেখলা পরিধান করিয়া যাইতে বাধ্য করা হইত।

মেখলা যে বেশ একটি সুশ্রী পরিচ্ছদ তাহাতে সন্দেহ নাই। মেখলায় সজ্জিত অসমীয়া বালিকা ও প্রৌঢ়াদের, শাড়ী পরিহিত বাঙ্গালী মেয়েদের চেয়ে, দেখিতে ছিমছাম ও সুন্দর বোধ হয়। কিন্তু জবরদস্তিতে বাধ্য হইয়া, যখন কোনরূপ পোষাক পরিতে হয়, তখন তাহা ভিন্ন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। লুঙ্গি কোন মন্দ বস্ত্র নয়। অনেক হিন্দু যুবকেরা বাড়ীতে লুঙ্গি পরিধান করিয়া থাকে। তাহা ত বেশ ভালই।

কিন্তু নোয়াখালীতে হিন্দুদের যখন লুঙ্গি পরিধান করিতে বাধ্য করা হয়,

তখন তাহা ভিন্ন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। আমার মনে হয়, অসমীয়ারা হয়ত জানেন না যে, বাঙ্গালী সধবা স্ত্রীলোকদের পক্ষে শাড়ী ও শাঁখা পরিধান অপরিহার্য পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মানা হয়। একথা জানা থাকিলে, আমার মনে হয়, তাঁহারা কদাচিৎ ঐরূপ কাজ করিতেন না।

নারী ধর্ষণ

তাহার পর নারীধর্ষণের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি আলোচনা করা এক জটিল ব্যাপার। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময়ও আমি সেবাকার্য করিয়াছিলাম। আমি জানি যে, ইহা এমন একটি ব্যাপার, হাঙ্গামার সময়ে যাহার সম্পর্কে অতিরঞ্জন ও অর্ধসত্য বিশ্রী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সেই জন্য নিজের ক্ষেত্রে আমি একটি নিয়ম করিয়া লইয়াছি যে, কোন নারী-ধর্ষণের অভিযোগ শুনিলে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ না পাইলে, আমি কদাপি সে সম্পর্কে কোন কথা বলিতে চাই না।

এই নিয়ম মতে হাঙ্গামার সময় ধর্ষিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত তিনটি মেয়ের সহিত সাক্ষাতে কথাবার্তা বলি। অপর কয়েকটি অভিযোগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মেয়েরা বাংলাদেশে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া আমি তাহাদের সাক্ষাৎ পাই নাই। নীতিগতভাবে আমার প্রত্যয় হইয়াছে যে, এই তিনটি মেয়েই ধর্ষিত হইয়াছিল। এই তিন জনের মধ্যে একটি মেয়ে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সে তাহার স্বামীর সমক্ষে আমার কাছে ধর্ষণের কাহিনী বিবৃত করে। আমার মনে হইল, এতকাল আমি যতকিছু শুনিয়াছি তাহার মধ্যে ইহাই নৃশংসতম ধর্ষণের ঘটনা। ইহা লক্ষ্য করিবার কথা যে, এক্ষেত্রে অপরাধীদের মধ্যে একজন ছাত্র ছিল এবং মহিলাটি তাহাকে পূর্ব হইতেই চিনিত।

অসমীয়া জনগণের সৎস্বভাব

অসমীয়া জনগণের মধ্যে আমি চার মাস কাল বসবাস ও আনাগোনা করিয়াছি। তাহারা বেশ সুন্দর স্বভাবের মানুষ ইহাই দেখিতে পাইয়াছি।

স্বভাবতই তাহারা সরল, সৎ, ঋজুস্বভাব এবং আদান প্রদানে সাধুস্বভাব। তাহারা একান্ত অতিথিপরায়ণ। এইরূপ সজ্জন সম্প্রদায় উপরিউক্ত অনাচারে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারিল তাহা ভাবিতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে হয়।

আসামে আমার অবস্থানের এই অল্পকাল মধ্যেই এই প্রদেশের লোকদের প্রতি আমার সুগভীর প্রীতি জন্মিয়াছে। সেই কারণে তাহাদের সম্মান ও সুনাম রক্ষার বিষয়ে আমি একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছি।

'পুবেরুণ' চলচ্চিত্র লইয়া অশান্তি

নওগাঁ জেলায় লামডিঙ একটি রেলওয়ে কলোনী। সেখানে বাঙ্গালী হিন্দুরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। জনকয়েক যুবক সেখানে 'পুবেরুণ' এই অসমীয়া চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনে বাধা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। দুইজন অসমীয়া রেলকর্মীর উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছোটখাট মারধর হয়। অসমীয়া রেলকর্মীদের মধ্যে পঞ্চাশটি পরিবার ভয়ে স্থানান্তরে চলিয়া যান, কিন্তু তাঁহারা কয়েকদিনের মধ্যেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন।

আমি সেইস্থলে গিয়া অসমীয়া রেলকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করি। বাস্তবিক কি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সৌজন্যবশে তাঁহারা নিজ মুখে আমার সাক্ষাতে বর্ণনা করেন। কিন্তু ঘটনার সময় দাবানলের মত সর্বত্র এই গুজব রটিয়া যায় যে, লামডিঙে দলবদ্ধভাবে অসমীয়াদের উপর পাশবিক আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাদের অনেককেই মারাত্মক জখম করা হইয়াছে, এবং অসমীয়া মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হইয়াছে।

মারিয়ানীতে বিক্ষোভ : 'বাংলাভাষা ছাগলী ভাষা'

বাহির হইতে ট্রেনযোগে বহু অসমীয়া ছাত্র 'মারিয়ানী'তে আসিয়া একত্রিত হয়। তাহারা শিলঙের ২১শে মে তারিখের শোভাযাত্রার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ-সূচক একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এই যাত্রায় "বাংলাভাষা ছাগলী ভাষা", সরবে এই বিক্ষোভধ্বনি দেওয়া হয় এবং পথের পাশে দোকানপাটের

বাংলা সাইনবোর্ডগুলি টানিয়া নামাইয়া, ভাঙ্গিয়া, বা বিকৃত করিয়া, দেওয়া হয়। পরে তাহারা যখন ট্রেনযোগে ফিরিতেছিল তখন ষ্টেশনের খানিক দূরে ঐ ট্রেন থামাইয়া কয়েকটি ছাত্র সম্ভবত বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রহৃত হয়।

অতিরঞ্জিত সংবাদ ও গুজব রটনা

কিন্তু ঘটনার বিষয়ে অতিরঞ্জিত সংবাদ আজগুবি গুজব ছড়াইয়া পড়ে ও নিজ কাজ করে। সকলের সেরা গুজব এই রটিয়া গেল যে, গৌহাটী গুলিবর্ষণে পুলিশের বাঙ্গালী ডি. আই. জি. এবং আই. জি.-র হাত ছিল। এই সকল গুজব ও অতিরঞ্জিত সংবাদ মিলিয়া যে হাঙ্গামার তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অসমীয়াদের সাধারণ অভিমত এই যে, যে সকল হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল, উপরিউক্ত এই তিনটি ঘটনা, বিশেষতঃ গৌহাটীতে গুলিবর্ষণই, সে সকলের জন্য দায়ী। অন্যথায় কিছুই ঘটিত না।

অথচ বাঙ্গালীদের দিকের কথা হইল এই যে, আসাম-প্রদেশ হইতে বাঙ্গালী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার জন্য অনুষ্ঠিত গুরুতর ঘটনাবলী বহু পূর্ব হইতেই ঘটিতে সুরু হইয়া গিয়াছিল। দৃষ্টান্ত ধরুন, হরতাল করিতে হইবে এই অজুহাতে, শিবসাগরের বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দোকান-পাট মাসাবধিকাল ধরিয়া একাদিক্রমে বন্ধ রাখিতে বাধ্য করা হইতেছিল। অন্যান্য স্থানেও অত্যাচার সংঘটিত হইতেছিল।

মুসলমানদের ভূমিকা

পাকিস্তান অভিমুখী দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত মুশলিম সাম্প্রদায়িকতার এই সকল হাঙ্গামার মধ্যে কোন হাত ছিল কি? আমার উত্তর হইল 'না'। আমার মনে হয় ইহা কতিপয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনের ইচ্ছাপ্রসূত কল্পনা মাত্র। গত উপদ্রবে যদি কোন অসমীয়া মুসলমান হাত লাগাইয়া থাকেন বা উহাতে সহায়তা করিয়া থাকেন বা উহার সহিত নৈতিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া

থাকেন তবে তাহারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুশ্‌লিমরূপে নহে বরং বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অসমীয়া পক্ষভুক্ত হইয়া তাহা করিয়া থাকিবেন।

তবে হাঙ্গামার সময় বাংলাভাষী মুসলমানদের আক্রমণ হইতে রেহাই দেওয়া হইল কেন? ইহার কারণ, গত সেন্সাসের সময় বাঙ্গালী মুসলমানেরা অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া লিখাইয়াছেন, এবং চাকরি, শিক্ষা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাহারা অসমীয়াদের আশু আস্পৃহা পূরণের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করিবেন না, এবং ভাষার প্রশ্নে তাহাদের কোন আগ্রহও নাই।

অপর পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাঙ্গামায় আক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে বাঙ্গালী মুসলমানেরা আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। গোরেশ্বর অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামে এবং গোয়ালপাড়া জেলার দুই তিন স্থানে যে মুসলমানেরা হাঙ্গামায় যোগ দিয়াছিল তাহার হেতু হইল, অন্যান্য কারণবশতঃ স্থানীয় বাঙ্গালী হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাহাদের মনে বিদ্বেষ জমিয়াছিল।

উপদ্রব পূর্ব পরিকল্পিত ছিল কি?

উপদ্রব সমূহের পিছনে কোন পরিকল্পনা ছিল কি? হাঙ্গামা বাস্তবিক পূর্বপরিকল্পনা মত করা হইয়াছিল কি না, সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়াও স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের দ্বারা জনগণ যেরূপ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে, স্থানীয় ক্ষেত্র ছাড়া পূর্বপরিকল্পনার কোন প্রয়োজন ছিল না। জনতার এরূপ উত্তাল আচরণকালে, যখন সমগ্র বাংলাভাষী সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সঞ্চার করা হইয়াছিল তখন, কোন অসমীয়ার কোন বাঙ্গালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ থাকিলে, এই পরিস্থিতির সুযোগে, সে যে তাহার পুরাতন আক্রোশ সুদে-আসলে মিটাইয়া লইতে অনুপ্রেরিত হইবে, তাহাতে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নাই। অতএব রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বাংলাভাষীদের রাজ্যের বাহির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন, জনগণের কোন অংশের মনে যদি এই ধারণা বদ্ধমূল থাকিয়া থাকে,

তবে তাহারাও হয়ত পরিস্থিতির সুযোগে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইতে চাহিয়া থাকিবে। এমন কি নিন্দিত সম্প্রদায়ের যে কাহারও সহিত যে কাহারও ব্যক্তিগত ঝগড়া ছিল সেও এই সুযোগে রাগ মিটাইয়া লইতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকিতে পারে।

কোন অসুস্থতার কারণে শরীরের প্রাণশক্তি কমিয়া গেলে শরীরের দুর্বল অংশগুলি রোগাক্রান্ত হয় এবং নানা উপসর্গ প্রকট করিয়া থাকে। ভাষা আন্দোলনের দ্বারা সৃষ্ট গণউন্মাদনার ধাক্কায় আসামের সমাজ দেহও অনুরূপ অসুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আক্রান্তদের রক্ষা ও আশ্রয়দান

কিন্তু গণ্ডগোলে প্রত্যেকেই মানসিক স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিলে অসমীয়া জনগণের প্রতি অবিচার করা হইবে। এমন বহু লোকই ছিলেন, যাঁহারা ঐ পরিস্থিতিতেও শান্ত অবিচলিত থাকিয়া আক্রমণের প্রাক্কালে বাঙ্গালী ভ্রাতৃবৃন্দকে রক্ষা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কয়েক ক্ষেত্রে এই চেষ্টায় তাহাদের জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। এরূপ অনেক উদাহরণের কথা আমার লেখা আছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি মহৎ দৃষ্টান্ত জনগণের চিরকালের অনুপ্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবে।

তথাপি অনেকেই মনে করেন যে হাঙ্গামার গতি প্রকৃতি দেখিয়া, এবং যে প্রকারে ও যে পদ্ধতিমত উহা সংঘটিত হয় তাহা দেখিয়া, মনে হয় উহার পশ্চাতে পরিকল্পনা ছিল এবং নেপথ্যে প্লানকর্তারাও ছিলেন। এবং ঐ প্লান সমগ্র প্রদেশ ধরিয়া না হউক, অন্তত আঞ্চলিক ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। হাঙ্গামা সম্পর্কে আমার সহিত আলোচনা কালে রাজনৈতিক দলের জনৈক জেলা সঞ্চালক মন্তব্য করেন যে হাঙ্গামা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল এবং ঐ পূর্বপরিকল্পনা মতই উহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমার ধারণা ভিন্নরূপ ছিল বলিয়া তাঁহার এই মন্তব্যে আমি বিস্মিত হই। আমি জিজ্ঞাসা করি "এই প্লানের সৃষ্টি-

কর্তা কাহারা ?" তিনি অকপটে নিজের সহচর এক দলের এবং আর এক পার্টির নাম করিয়া তাহারাই এজন্য দায়ী, এই কথা বলেন। পরে দলের কয়েকজন নেতাকে আমি এই আলোচনার কথা জানাই। তাঁহারা এই অভিযোগ একবারে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, অভিযোগকারী নিজেই তাহার জেলার হাঙ্গামার পিছনে ছিলেন। তাঁহারা প্লানের জন্য দায়ী করিয়া তৃতীয় একটি দলের নাম করেন। শেষোক্ত দলের নেতাও কিন্তু এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং হাঙ্গামার জন্য অন্যান্য দলকে দায়ী করেন।

সকল দলই অভিযুক্ত

এই ভাবে অভিযোগ ও প্রতিঅভিযোগের মধ্যে সকল দলই পড়িয়া গিয়াছেন। অতএব যুক্তিমতেই এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে হয়, সকল রাজনৈতিক দলই প্লানের সহিত কমবেশী জড়িত ছিলেন, নতুবা প্লানের পিছনে কেহই ছিলেন না। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি হাঙ্গামার পশ্চাতে সুচিন্তিত প্লান অবশ্যই ছিল, এরূপ ধরিয়া লইবার প্রয়োজন নাই, কারণ প্রশ্নটি জনমন অধিকার করিয়াছিল, এবং দেশে উত্তাল আলোড়ন উত্থিত হইয়াছিল। তবে একথা নিশ্চয় মনে হয় যে, ভোট প্রাপ্তির প্রতিযোগিতার যুগে, কোন রাজনৈতিক দল সংকট মুহূর্তে পরিস্থিতির যোগ্য প্রত্যাশিত উচিৎ আচরণ করিবেন, এরূপ সাহস কোন দলেরই আজ নাই।

সংবাদপত্রের ভূমিকা

হাঙ্গামার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলি যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, পশ্চিম বঙ্গের বাহিরে তাহা লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। অনেকে এরূপ বলেন যে, কলিকাতার একশ্রেণীর সংবাদপত্র অসমীয়াদিগকে আরও অধিক উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া এবং বাংলাভাষীদের আতঙ্ক আরও বাড়াইয়া দিয়া, শান্তিরক্ষার পক্ষে বড়ই ক্ষতি করিয়াছেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করেন যে, কলিকাতার

সংবাদপত্রগুলি ছিল তাই রক্ষা, নচেৎ আসামের ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী বহির্জগতের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত এবং ঐ সর্বনাশা ধ্বংসকাণ্ড অবাধে দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতে পারিত, কারণ আসাম ও ভারতের অন্য প্রদেশের সংবাদপত্রগুলি আসামের এই সকল ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রায় পরিপূর্ণ সংবাদ বিলোপ করিয়া নীরবতার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তথ্য সংগ্রহে বাধা

তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে অতিরঞ্জিত বা অসত্য বিবরণী, যাহা কলিকাতার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে, তাহা ঐ পরিস্থিতিতে অনিবার্য হইয়াছিল, কারণ দায়িত্বশীল সাংবাদিকেরা নির্ভুল তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহের জন্য অকুস্থলে অবাধে যাতায়াত করিতে পান নাই। যাহা হউক, গৌহাটীতে পৌঁছিবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমি একটি বিবৃতি দিই। হাঙ্গামা প্রায় প্রশমিত হইবার পরেও, তখন যে ভাবে ঐ সম্পর্কে সংবাদের চর্চা চলিতেছিল, তাহার জন্য এই বিবৃতিতে কলিকাতা সংবাদপত্রগুলির সমালোচনা করি। সংবাদপত্রে সমগ্র অসমীয়া সমাজের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া অযোগ্য ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া আমি একান্ত পীড়া অনুভব করি।

পত্রিকায় বিদ্বেষের ইন্ধন

আমার সেই বিবৃতি পড়িয়া জনৈক বন্ধু বলিয়া উঠেন "আপনি আসামের সংবাদপত্রগুলিরও সমালোচনা করেন নাই কেন? ঐ পত্রিকাগুলির পুরাণো সংখ্যাগুলির পাতা উল্টাইলে আপনি পীড়া অনুভব করিবেন। তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে তাহারা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষের ইন্ধন জোগাইয়াছে এবং আসামের ভয়াবহ ঘটনাবলীকে লঘু করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে। সমগ্র নওগাঁ জেলার ভয়াবহ ঘটনাবলীর সংবাদটি তাহারা মাত্র ৪ (চার) লাইনেই সাঙ্গ করিয়া দিয়াছিল।"

উত্তরে আমি বলি "বাংলা সংবাদপত্রগুলির সমালোচনা করা আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যদি সত্য হয়, তবে অসমীয়া জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হইবে অসমীয়া সংবাদপত্রগুলির সমালোচনা করা। অসমীয়া নেতৃবৃন্দের এই কর্তব্যের ক্ষেত্রে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।"

হাঙ্গামার সঠিক সংবাদ প্রয়োজন

হাঙ্গামার সময় যে সকল ঘটনা ঘটে, সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা মোটেই উচিত হয় কি না, তাহাও একটি বিতর্কের বিষয়। অনেক লোকের মতে, ঐ সব খবর বাহির না করাই ভাল, কারণ খবরগুলি অন্যত্র অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনুরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠানের প্ররোচনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে পারে এবং হাঙ্গামা বিস্তারের সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, সংবাদপত্রে সকল খবর চাপিয়া গেলে, উহাতে গুজব সৃষ্টির সুযোগ হয়। আজগুবি সব গুজব রটিতে থাকে, এবং ঘটনাবলীর নির্ভুল খবর কাগজে বাহির হইলে যতটা ক্ষতি হইতে পারে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হইয়া যায়।

মধ্য পন্থা বাঞ্ছনীয়

অতএব মধ্য পন্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। অপ্রমাণিত কোন সংবাদ বাহির করা উচিত নহে। সংবাদ পরিবেশনে উত্তেজনা বা প্ররোচনাদায়ক অথবা কটূক্তিসূচক বাক্যাদি সাবধানে পরিহার করিয়া চলা উচিত। দুর্ঘটনার নিন্দা প্রসঙ্গে ভর্ৎসনাসূচক বাক্যাদির পরিবর্তে বুঝাইবার দিকে সুযুক্তি প্রয়োগ করা উচিত। ঘটনা ঘটিবামাত্র উহার সংবাদ প্রচার করিতে হইবে, সকল ক্ষেত্রে এরূপ প্রয়োজন থাকে না। অবস্থা অনুসারে উহার বিচার করা উচিত। জনগণের সামূহিক উত্তেজনার সময়কালে ঘটনাবলীর সংবাদ সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা একপ্রকার বিশেষ কলা-কুশলতা সাপেক্ষ। আমাদের সংবাদ-পত্রগুলির ঐ কুশলতা আয়ত্ত করিতে হইবে। যে দিক দিয়াই হউক, ভয়াবহ বা

সামান্য যেরূপই হউক হাঙ্গামার সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে জনগনকে অজ্ঞ অবস্থায় ফেলিয়া রাখা কখনই উচিত নহে।

জুলাইএর সত্য ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা

শিক্ষিত অসমীয়াদের মধ্যে যাঁহারা কেবল অসমীয়া সংবাদপত্র পাঠে অভ্যস্ত তাঁহাদের অনেকেই জুলাই মাসে হাঙ্গামার সময় যথার্থ কি ঘটিয়াছিল, সে সম্পর্কে আজিও অজ্ঞ থাকিয়া গিয়াছেন। সেই কারণে হাঙ্গামার ঘটনাবলীকে তাহারা যতদূর সম্ভব লঘু করিয়া উড়াইয়া দিতে উৎসুক। ইহার কারণ এই যে, আসামের সংবাদপত্রগুলি জুলাইএর হাঙ্গামা সম্বন্ধে প্রায় কোন খবরই প্রকাশ করে নাই।

বাংলাভাষীদের স্মরণীয়

আসামের বাংলাভাষী জনগণ নানারূপ ভয়াবহ শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। এ সময়ে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে যদি কঠিন কথা বলি, তবে তাহাতে তাহাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে, একথা আমি জানি। তথাপি আমার মনে হয়, এখন যদি আমি উহা না বলি, তবে আমার কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। নিজেদের বুদ্ধি ও তথাকথিত বাঙ্গালী সংস্কৃতি সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের মনে বৃথা আত্মাভিমান আছে। তাহাদের এখনও এইটি শিখিতে বাকী আছে যে, বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলিয়া পৃথক কোন সংস্কৃতির অস্তিত্ব নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতি

ভারতে যদি কোন বিশেষ সংস্কৃতি থাকে তবে তাহা ভারতীয় সংস্কৃতি। ভারতে অন্য কোন পৃথক সংস্কৃতি নাই। সকলকে একথাও শিখিতে হইবে যে, যাহাদের মধ্যে বসবাস করিতে হয় তাহাদের নিকট হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখিতে নাই। যে বুদ্ধি এই শিক্ষা দেয় তাহাই উত্তম গুণযুক্ত শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি। আজিকার ক্ষণে বাঙ্গালীদের পক্ষে যদি কোন শিক্ষা গ্রহণের

সর্বাধিক প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে তবে তাহা এই যে, দেশের অন্য প্রদেশের লোকের সহিত ক্ষণকালেরও সংস্পর্শে আসিবার সময় এবং অন্য প্রদেশীয়দের সম্পর্কে অপর কাহারও কাছে বা নিজেদের মধ্যে মন্তব্য কালে যেন জিহ্বা সংযত করা হয়।

ভারতের লোকদের সঙ্গে সংস্পর্শ বা লেনদেনের সময় প্রত্যেক বাঙ্গালী যেন মনে রাখেন যে, তিনি সেই ক্ষণে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। তখন তিনি যাহা বলেন বা যেরূপ আচরণ করেন, তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কথার বা আচরণের প্রতীক বলিয়া ধরা হইবে, জানিবেন। তাহার মনে এই ভাব জাগিয়া থাকা চাই যে তাহার সেই ক্ষণের কথা ও আচরণের উপর বাঙ্গালী জাতির সুনাম নির্ভর করে।

বাঙ্গালীদের আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, যে মায়ের কোলে বহু সন্তানের জন্ম হইয়াছে এবং আরও বহুর জন্ম হইবে এবং যিনি স্বগৃহে তাহাদের সকলের স্থান সংকুলান ও লালন পালন করিতে পারিবেন না, তাহাদের আশ্রয় ও পালনের জন্য যাঁহাকে প্রতিবেশীদের উপর নির্ভর করিতে হইবে, প্রতিবেশীদের সহিত আচরণে তাঁহাকে সর্বদা বিনয়নম্র ব্যবহার করিতে হইবে। প্রতিবেশীদের প্রতি বঙ্গমাতার মনোভাব নূতন গুণে সমৃদ্ধ করিতে হইবে।

বাংলাভাষীদের ভবিষ্যৎ

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছয়টি জেলাবাসী বাংলাভাষী জনগণ বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে নিরাপদে মর্যাদা ও আত্মসম্মানের সহিত বসবাস করিতে পারিবেন কি? এই অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি উহাদের কল্যাণে আগ্রহান্বিত সকলেরই মনকে আলোড়িত করিতেছে। এই প্রশ্নের উত্তর যদি "না" এই হয়, তবে যে মিশন সিদ্ধির কর্তব্যভার নিজ স্কন্ধে লইয়া ভারত পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য এবং উহার ফলে ভারতবর্ষ অবশেষে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া সর্বনাশের পথে যাইতে পারে।

ভারতের মিশন ঃ বিবিধের মধ্যে ঐক্য

ভারতের এই মিশন হইল বিবিধের মধ্যে ঐক্যসাধন। পূর্বেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ভারতের ঐরূপ ভয়াবহ পরিণামের কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।

আসামের ভবিতব্য ঃ ঐক্যের সাধনা

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সর্বত্র পদব্রজে যাত্রাকালে, আমার মনে একদিন হঠাৎ একটি চিন্তার উদয় হয়। তাহা এই যে, ভারতের সকল অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সর্বাগ্রে আসাম রাজ্যই 'বিবিধের মধ্যে ঐক্য'—ভারতের এই মিশন সার্থক করিয়া তুলিবে, ইহাই বিধিলিপি মনে হয়। সেই দিন হইতে এই ভাবনা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমার মনে হয়, আসামেই যেন বিধাতা এই মন্ত্র-সিদ্ধির বিশেষ অনুকুল ক্ষেত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন।

আসাম প্রদেশকে জাতিবিজ্ঞানীদের স্বর্গ বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নানা জাতির, নানা বর্ণের, লোক এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, বাদবিসংবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে সকলে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় স্থিতিলাভ করে এবং সাধারণ পরম্পরা ও আস্পৃহাযুক্ত একটা মিলিত জীবনাদর্শ গড়িয়া তুলিতে থাকে। আধুনিক কালেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকজন অর্থ নৈতিক কারণে আসিয়া আসামের স্নেহময় ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়াছে। এই ভাবে সমগ্র ভারতে আসাম এক অনুপম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দিক দিয়া আসাম সমগ্র ভারতের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ।

ভারতের ঐতিহ্য

এই স্থানেই দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ঐক্যসূত্র রচিত হইবে। আরম্ভে বিরোধ, পরে পুনর্মিলন ও সামঞ্জস্য, এই সকলই ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরা। অসমীয়াভাষী জনগণ শীঘ্রই একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবেন যে, ইহাই আসামের ভবিতব্য, এবং ভারতের মিশন জয়যুক্ত করিবার জন্য, আসামকে তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। অতএব শুধু বাংলা-

ভাষী জনগণের পক্ষেই নহে, দেশের অপর সকল জাতির পক্ষেই, আসামে চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করিতে হইবে।

আসাম আদর্শ অঙ্গরাজ্য হউক

বাংলাভাষী ও অপরাপর জনগণ ও পার্বত্য জাতির জনগণ পরস্পর প্রতিবেশীরূপে শান্তি, সদ্ভাব ও সুখে মিলিত থাকিয়া শীঘ্রই একটি দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আসাম প্রদেশ গড়িয়া তুলিবে এবং ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের আদর্শ স্থল হইয়া উঠিবে। সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠিকে অনুগ্রহপূর্বক ভগবান এই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের সাহস ও শক্তি দান করিবেন। মানসপটে এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা আসামে পরিব্রজন এবং সেবার কাজ করিয়া চলিয়াছি।

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাঃ সর্বমানবাঃ ॥"

বিনীত নিবেদন, ইতি—

সেবক
চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

নিবেদনে স্বাক্ষরকারী সহযোগী সেবকবৃন্দ :

১৩শ সর্বোদয় সম্মেলন — নবকৃষ্ণ চৌধুরী
সর্বোদয়পুরম্ — তিমাইয়া নায়ক
পশ্চিম গোদাবরী — রাওসাহেব পট্টবর্ধন
১৮ই এপ্রিল ১৯৬১ — শ্যামসুন্দর শুকলা

সর্বসেবা সংঘ প্রকাশিত 'থট্‌স্ অন্ আসাম ডিস্‌টারব্যান্‌সেস্' পুস্তিকা হইতে অনূদিত। অনুচ্ছেদ শিরোনামাগুলি নূতন সন্নিবেশিত।

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি ৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২
৫ই জুলাই ১৯৬১

সুধীরচন্দ্র লাহা

সর্বোদয় সাহিত্য

১। গীতা প্রবচন (৫ম সং) —বিনোবা ১·৫০
২। স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন " ১·৫০
৩। সাধনা " ০·৫৬
৪। প্রেমময় বাংলা " ১·৫০
৫। শিক্ষা বিচার " ৩·৫০
৬। স্বরাজ শাস্ত্র " ০·৭৫
৭। গ্রামে গ্রামে স্বরাজ " ০·২৫
৮। ভূদান যজ্ঞ কি ও কেন (৩য় সং) —চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ২·০০
৯। গ্রামদান (২য় সং) " ১·৫০
১০। যাত্রার পথে " ০·৯০
১১। শান্তিসেনা " ০·৫০
১২। বিনোবা (জীবনী) —বীরেন্দ্রনাথ গুহ ১·০০
১৩। ভূদান-যজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ " ০·২৫
১৪। গান্ধীজী কি চান —নির্মলকুমার বসু ০·৭৫
১৫। সর্বোদয় অর্থব্যবস্থা —গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি ১·০০
১৬। সারথি—মাখনলাল গুপ্ত ০·৪০
১৭। মহাজীবন " ০·৪০
১৮। ভূদান গীতি ০.০৯
১৯। সর্বোদয় পাত্র " ০·১২
২০। প্রার্থনা " ০·১০
২১। আচার্য বিনোবা (জীবনী)— বিধুভূষণ দাসগুপ্ত (২য় সং) ২·০০
বোর্ড বাঁধাই ২·৫০
২২। সর্বোদয়ের গান " ০·৪০
২৩। দিল্লী ডায়েরী— গান্ধীজী ৪·০০
২৪। গান্ধীজীর স্বদেশী ১·০০
২৫। বিনোবার ছবি ০·০৬, ০·৩০
২৬। গ্রামে ও পথে—রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ২·০০

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি ৫২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২

"সকল প্রদেশের লোকেরাই ভারতের লোক এবং ভারত ইহাদের সকলেরই দেশ।"

—গান্ধী